# Ek Dojon Sukumar

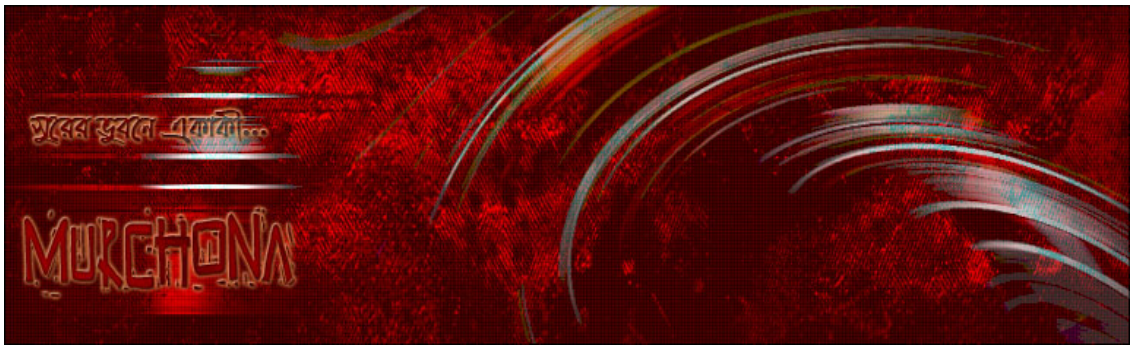


For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com

# আশ্চর্য কবিতা

আমাদের ক্লাশে একটি নূতন ছাত্র আসিয়াছে। সে আসিয়া প্রথম দিনই সকলকে জানাইল, "আমি পোইট্‌রি লিখতে পারি !" একথা শুনিয়া ক্লাশের অনেকেই অবাক হইয়া গেল; কেবল দুই-একজন হিংসা করিয়া বলিল, "আমরাও ছেলেবেলার ঢের ঢের কবিতা লিখেছি।" নতুন ছাত্রটি বোধহয় ভাবিয়াছিল, সে কবিতা লিখিতে পারে শুনিয়া ক্লাশে খুব হুলুস্থুল পড়িয়া যাইবে এবং কবিতার নমুনা শুনিবার জন্য সকলে হা হা করিয়া উঠিবে। যখন সেরূপ কিছুরই লক্ষণ দেখা গেল না তখন বেচারা, যেন আপন মনে কি কথা বলিতেছে, এরূপভাবে, যাত্রার মতো সুর করিয়া একটা কবিতা আওড়াইতে লাগিল—

ওহে বিহঙ্গম তুমি কিসের আশায়
বসিয়াছ উচ্চ ডালে সুন্দর বাসায়?
নীল নভোমন্ডলেতে উড়িয়া উড়িয়া
কত সুখ পাও, আহা ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
যদ্যপি থাকিত মম পুচ্ছ এবং ডানা
উড়ে যেতাম তব সনে নাহি শুনে মানা—

কবিতা শেষ হইতে না হইতে, ভবেশ তাহার মতো সুর করিয়া মুখভঙ্গী করিয়া বলিল—

আহা, যদি থাক্‌ত তোমার
ল্যাজের উপর ডানা
উড়ে গেলেই আপদ যেত—
করত না কেউ মানা !

নূতন ছাত্র তাহাতে রাগিয়া বলিল, "দেখ বাপু, নিজেরা যা পার না, তা ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেওয়া ভারি সহজ। শৃগাল ও দ্রাক্ষাফলের গল্প শোনোনি বুঝি?" একজন ছেলে অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো মুখ করিয়া বলিল, "শৃগাল এবং দ্রাক্ষাফল ! সে আবার কি গল্প?" অমনি নূতন ছাত্রটি আবার সুর ধরিল—

বৃক্ষ হতে দ্রাক্ষ্যফল ভক্ষণ করিতে
লোভী শৃগাল প্রবেশিল এক দ্রাক্ষা ক্ষেতে
কিন্তু হায় দ্রাক্ষা যে অত্যন্ত উচ্চে থাকে
শৃগাল নাগাল পাবে কিরূপে তাহাকে,
বারম্বার চেষ্টায় হয়ে অকৃতকার্য
'দ্রাক্ষা টক' বলিয়া পালাল ছেড়ে রাজ্য।

সেই হইতে আমাদের হরেরাম একেবারে তাহার চেলা হইয়া গেল। হরেরামের কাছে আমরা শুনিলাম যে ছোকরার নাম শ্যামলাল। সে নাকি এত কবিতা লিখিয়াছে যে, একখানা আস্ত খাতা প্রায় ভরতি হইয়াছে আর আট-দশটি কবিতা হইলেই তাহার

একশোটা পুরো হয় ; তখন সে নাকি বই ছাপাইবে।

ইহার মধ্যে একদিন এক কান্ড হইল। গোপাল বলিয়া একটি ছেলে স্কুলে ছাড়িয়া যাইবে এই উপলক্ষে শ্যামলাল এক প্রকান্ড কবিতা লিখিয়া ফেলিল। তাহার মধ্যে' 'বিদায় বিদায়' বলিয়া অনেক 'অশ্রুজল' 'দুঃখশোক' ইত্যাদি কথা ছিল। গোপাল কবিতার আধখানা শুনিয়াই একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, "ফের যদি আমার নামে পোইট্‌রি লিখবি তো মারব এক থাপ্পড়।" হরেরাম বলিল, "আহা বুঝলে না? তুমি স্কুল ছেড়ে যাচ্ছ কিনা, তাই ও লিখেছে।" গোপাল বলিল, "ছেড়ে যাচ্ছি তা যাচ্ছি, তোর তাতে কি রে? ফের জ্যাঠামি করবি তো তোর কবিতার খাতা ছিঁড়ে দেব।"

দেখিতে দেখিতে শ্যামলালের কথা ইস্কুলময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তাহার দেখাদেখি আরও অনেকেই কবিতা লিখিতে শুরু করিল। ক্রমে কবিতা লেখার বাতিকটা ভয়ানক রকম ছোঁয়াচে হইয়া নিচের ক্লাশের প্রায় অর্ধেক ছেলেকে পাইয়া বসিল। ছোট ছোট ছেলেদের পকেটে ছোট ছোট কবিতার খাতা দেখা দিল। বড়দের মধ্যে কেহ শ্যামলালের চেয়েও ভালো কবিতা লিখিতে পারে বলিয়া শোনা যাইতে লাগিল। ইস্কুলের দেয়ালে, পড়ার কেতাবে, পরীক্ষার খাতায়, চারিদিকে কবিতা গজাইয়া উঠিল।

পাঁড়েজির বৃদ্ধ ছাগল যেদিন শিং নাড়িয়া দড়ি ছিঁড়িয়া ইস্কুলের উঠানে দাপাদাপি করিয়াছিল, আর শ্যামলালকে তাড়া করিয়া খানায় ফেলিয়াছিল, তাহার পরদিন ভারতবর্ষের বড় ম্যাপের উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা বাহির হইল—

পাঁড়েজির ছাগলের একহাত দাড়ি,
অপরূপ রূপ তার যাই বলিহারি !
উঠানে দাপটি করি নেচেছিল কাল
তারপর কি হইল জানে শ্যামলাল।

শ্যামলালের রঙটি কালো কিন্তু কবিতা পড়িয়া যে যথার্থই চটিয়া লাল হইল, এবং তখনি তাহার নিচে একটা কড়া জবাব লিখিতে লাগিল। সে সবেমাত্র লিখিয়াছে—'রে অধম কাপুরুষ পাষন্ড বর্বর—' এমন সময় গুরু গম্ভীর গলা শোনা গেল—"ম্যাপের উপর কি লেখা হচ্ছে?" ফিরিয়া দেখে হেডমাস্টার মহাশয় ! শ্যামলাল একেবারে থতমত খাইয়া বলিল, "আজ্ঞে স্যার, আগে ওরা লিখেছিল।" "ওরা কারা?" শ্যামলাল বোকার মতো একবার আমাদের দিকে, একবার কড়িকাটের দিকে তাকাইতে লাগিল, কাহার নাম করিবে বুঝিতে পারিল না। মাস্টার মহাশয় আবার বলিলেন, "ওরা যদি পরের বাড়ি সিঁদ কাটতে যায়, তুমিও কাটবে?" যাহা হউক সেদিন অল্পের উপর দিয়াই গেল, শ্যামলাল একটু ধমক-ধামক খাইয়াই খালাস পাইল।

# ভোলানাথের সর্দারি

সকল বিষয়েই সর্দারি করিতে যাওয়া ভোলানাথের ভারি একটা বদ অভ্যাস। যেখানে তাহার কিছু বলিবার দরকার নেই, সেখানে সে বিজ্ঞের মতো উপদেশ দিতে যায়, যে কাজের সে কিছুমাত্র বোঝে না, সে কাজেও সে চট্‌পট্ হাত লাগাইতে ছাড়ে না। এইজন্য গুরুজনেরা তাহাকে বলেন 'জ্যাঠা'—আর সমবয়সীরা বলে 'ফড়ফড়ি রাম'! কিন্তু তাহাতে তাহার কোনো দুঃখ নেই, বিশেষ লজ্জাও নাই। সেদিন তাহার তিন ক্লাশ উপরের বড় বড় ছেলেরা যখন নিজেদের পড়াশুনা লইয়া আলোচনা করিতেছিল, তখন ভোলানাথ মুরুব্বির মতো গম্ভীর হইয়া বলিল, "ওয়েবস্টারের ডিক্‌সনারি সব চাইতে ভালো। আমার বড়দা যে দু'ভলুম ওয়েবস্টারের ডিকনারি কিনেছেন, তার এক-একখানা বই এত্তোখানি বড় আর এম্নি মোটা আর লাল চামড়া দিয়ে বাঁধানো। উঁচু ক্লাশের একজন ছাত্র আচ্ছা করিয়া তাহার কান মলিয়া বলিল, "কি রকম লাল হে? তোমার এই কানের মতো?" তবু ভোলানাথ এমন বেহায়া, সে তার পরদিনই সেই তাহাদের কাছে ফুটবল সম্বন্ধে কি যেন মতামত দিতে গিয়া এক চড় খাইয়া আসিল।

বিশুদের একটা ইঁদুর ধরিবার কল ছিল। ভোলানাথ হঠাৎ একদিন্ "এটা কিসের কল ভাই?" বলিয়া সেটাকে নাড়িয়া চাড়িয়া কলকব্জা এমন বিগড়াইয়া দিল যে, কলটা একেবারেই নষ্ট হইয়া গেল। বিশু বলিল, "না, জেনে শুনে কেন টানাটানি করতে গেলি" ভোলানাথ কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া বলিল, "আমার দোষ হল বুঝি? দেখ্ তো হাতলটা কিরকম বিচ্ছিরি বানিয়েছে। ওটা আরও অনেক মজবুত করা উচিত ছিল। কলওয়ালা ভয়ানক ঠকিয়েছে।"

ভোলানাথ পড়াশুনায় যে খুব ভালো ছিল তাহা নয়, কিন্তু মাস্টার মহাশয় যখন কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, তখন সে জানুক আর না জানুক সাত তাড়াতাড়ি সকলের আগে জবাব দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিত। জবাবটা অনেক সময়েই বোকার মতো হইত, শুনিয়া মাস্টার মহাশয় ঠাট্টা করিতেন, ছেলেরা হাসিত; কিন্তু ভোলানাথের উৎসাহ তাহাতে কমিত না।

সেই যেবার ইস্কুলে বই চুরির হাঙ্গামা হয়, সেবারও সে এইরকম সর্দারি করিতে গিয়া খুব জব্দ হয়। হেডমাস্টার মহাশয় ক্রমাগত বই চুরির নালিশে বিরক্ত হইয়া, একদিন প্রত্যেক ক্লাশে গিয়া জিগ্‌গেস করিলেন, "কে চুরি করছে তোমরা কেউ কিছু জানো?" ভোলানাথের ক্লাশে এই প্রশ্ন করিবামাত্র ভোলানাথ তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "আজ্ঞে, আমার বোধ হয় হরিদাস চুরি করে।" জবাব শুনিয়া আমরা সবাই অবাক হইয়া গেলাম। হেডমাস্টার মহাশয় বলিলেন, "কি করে জানলে যে হরিদাস চুরি করে?" ভোলানাথ অম্লানবদনে বলিল, "তা জানিনে, কিন্তু আমার মনে হয়।"

মাষ্টার মহাশয় ধমক দিয়া বলিলেন, "জানো না, তবে অমন কথা বললে কেন? ও রকম মনে করবার তোমার কি কারণ আছে?" ভোলানাথ আবার বলিল, "আমার মনে হচ্ছিল, বোধহয় ও নেয়—তাই তো বললাম। আর তো কিছু আমি বলিনি।" মাষ্টার মহাশয় গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "যাও, হরিদাসের কাছে ক্ষমা চাও।" তখনই তাহার কান ধরিয়া হরিদাসের কাছে ক্ষমা চাওয়ানো হইল। কিন্তু তবু কি তাহার চেতনা হয়?

ভোলানাথ সাঁতার জানে না, কিন্তু তবু সে বাহাদুরি করিয়া হরিশের ভাইকে সাঁতার শিখাইতে গেল। রামবাবু হঠাৎ ঘাটে আসিয়া পড়েন, তাই রক্ষা। তা না হইলে দুজনকেই সেদিন ঘোষপুকুরে ডুবিয়া মরিতে হইত। কলিকাতায় মামার নিষেধ না শুনিয়া চল্‌তি ট্রাম হইতে নামিতে গিয়া ভোলানাথ কাদার উপর যে আছাড় খাইয়াছিল, তিন মাস পর্যন্ত তাহার আঁচড়ের দাগ তাহার নাকের উপর ছিল। আর বেদেরা শেয়াল ধরিবার জন্য যেবার ফাঁদ পাতিয়া রাখে, সেবার সেই ফাঁদ ঘাঁটিতে গিয়া ভোলানাথ কি রকম আটকা পড়িয়াছিল, সেকথা ভাবলে আজও আমাদের হাসি পায়। কিন্তু সব চাইতে যেবার সে জব্দ হইয়াছিল সেবারের কথা বলি শোনো।

আমাদের ইস্কুলে আসিতে হইলে কলেজবাড়ির পাশ দিয়া আসিতে হয়। সেখানে একটা ঘর আছে, তাহাকে বলে ল্যাবরেটরি। সেই ঘরে নানারকম অদ্ভুত কলকারখানা থাকিত। ভোলানাথের সবটাতেই বাড়াবাড়ি, সে একদিন একেবারে কলেজের ভিতর গিয়া দেখিল, একটা কলের চাকা ঘুরানো হইতেছে, আর কলের একদিকে চড়াক্ চড়াক্ করিয়া বিদ্যুতের মতো ঝিলিক্ জ্বলিতেছে। দেখিয়া ভোলানাথের ভারি শখ হইল সে একবার কল ঘুরাইয়া দেখে ! কিন্তু কলের কাছে যাওয়া মাত্র, কে একজন তাহাকে এমন ধমক দিয়া উঠিল যে, ভয়ে এক দৌড়ে সে ইস্কুলে আসিয়া হাঁপাইতে লাগিল। কিন্তু কলটা একবার নাড়িয়া দেখিবার ইচ্ছা তাহার কিছুতেই গেল না। একদিন বিকালে যখন সকলে বাড়ি যাইতেছি তখন ভোলানাথ যে কোন সময়ে কলেজবাড়িতে ঢুকিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। সে চুপিচুপি কলেজ-বাড়ির ল্যাবরেটরি বা যন্ত্রখানায় ঢুকিয়া, অনেকক্ষণ এদিক ওদিক চাহিয়া দেখে, ঘরে কেউ নাই। তখনই ভরসা করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া সে কলকব্জা দেখিতে লাগিল। সেই দিনের সেই কলটা আলমারির আড়ালে উঁচু তাকের উপর তোলা রহিয়াছে, সেখানে তাহার হাত যায় না। অনেক কষ্টে সে টেবিলের পিছন হইতে একখানা বড় চৌকি লইয়া আসিল। এদিকে কখন যে কলেজের কর্মচারী চাবি দিয়া ঘরের তালা আঁটিয়া চলিয়া গেল, সেও ভোলানাথকে দেখে নাই, ভোলানাথেরও সেদিকে চোখ নাই। চৌকির উপর দাঁড়াইয়া ভোলানাথ দেখিল কলটার কাছে একটা অদ্ভুত বোতল। সেটা যে বিদ্যুতের বোতল, ভোলানাথ তাহা জানে না। সে বোতলটিকে ধরিয়া সরাইয়া রাখিতে গেল। অমনি বোতলের বিদ্যুৎ হঠাৎ তাহার শরীরের ভিতর দিয়া

ছুটিয়া গেল, মনে হইল যেন তাহার হাড়ের ভিতর পর্যন্ত কিসের একটা ধাক্কা লাগিল, সে মাথা ঘুরিয়া চৌকি হইতে পড়িয়া গেল।

বিদ্যুতের ধাক্কা খাইয়া ভোলানাথ খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া রহিল। তারপর ব্যস্ত হইয়া পলাইতে গিয়া দেখে দরজা বন্ধ ! অনেকক্ষণ দরজায় ধাক্কা দিয়া, কিল ঘুঁষি লাথি মারিয়াও দরজা খুলিল না। জানালাগুলি অনেক উঁচুতে আর বাহির হইতে বন্ধ করা—চৌকিতে উঠিয়াও নাগাল পাওয়া গেল না। তাহার কপালে দরদর করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। সে ভাবিল প্রাণপণে চীৎকার করা যাক, যদি কেউ শুনিতে পায়। কিন্তু তাহার গলার স্বর এমন বিকৃত শোনাইল, আর মস্ত ঘরটাতে এমন অদ্ভুত প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল যে, নিজের আওয়াজে নিজেই সে ভয় পাইয়া গেল। ওদিকে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। কলেজের বটগাছটির উপর হইতে একটা পেঁচা হঠাৎ 'ভুত-ভূতুম-ভূত' বলিয়া বিকট শব্দে ডাকিয়া উঠিল। সেই শব্দে একেবারে দাঁতে দাঁতে লাগিয়া ভোলানাথ এক চীৎকারেই অজ্ঞান !

কলেজের দারোয়ান তখন আমাদের ইস্কুলের পাঁড়েজি আর দু-চারটি দেশ-ভাইয়ের সঙ্গে জুটিয়া মহা উৎসাহে 'হাঁ হাঁ করে কাঁহা গয়ো রাম' বলিয়া ঢোল কর্তাল পিটাইতেছিল, তাহারা কোনোরূপ চীৎকার শুনিতে পায় নাই। রাতদুপুর পর্যন্ত তাহাদের কীর্তনের হল্‌লা চলিল; সুতরাং জ্ঞান হইবার পর ভোলানাথ যখন দরজায় দুম্‌দুম্‌ লাথি মারিয়া চেঁচাইতেছিল, তখন সে শব্দ গানের ফাঁকে ফাঁকে তাহাদের কানে একটু-আধটু আসিলেও তাহারা গ্রাহ্য করে নাই। পাঁড়েজি একবার খালি বলিয়াছিল, কিসের শব্দ একবার খোঁজ লওয়া যাক, তখন অন্যেরা বাধা দিয়া বলিয়াছিল, "আরে চিল্‌ল্যানে দেও।" এমনি করিয়া রাত বারোটার সময় যখন তাহাদের উৎসাহ ঝিমাইয়া আসিল, তখন ভোলানাথের বাড়ির লোকেরা লণ্ঠন হাতে হাজির হইল। তাহারা বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া কোথাও তাহাকে আর খুঁজিতে বাকি রাখে নাই। দারোয়ানদের জিজ্ঞাসা করায় তাহারা একবাক্যে বলিল, 'ইস্কুল বাবুদের' কাহাকেও তাহারা দেখে নাই। এমন সময় সেই দুম্‌দুম্‌ শব্দ আর চীৎকার আবার শোনা গেল।

তারপর ভোলানাথের সন্ধান পাইতে আর বেশি দেরি হইল না। কিন্তু তখনও উদ্ধার নাই—দরজা বন্ধ, চাবি গোপালবাবুর কাছে, গোপালবাবু বাসায় নাই, ভাইজির বিবাহে গিয়াছেন, সোমবার আসিবেন। তখন অগত্যা মই আনাইয়া, জানালা খুলিয়া, সার্সির কাঁচ ভাঙিয়া, অনেক হাঙ্গামার পর ভয়ে মৃতপ্রায় ভোলানাথকে বাহির করা হইল। সে ওখানে কি করিতেছিল, কেন আসিয়াছিল, কেমন করিয়া আটকা পড়িল ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাহার বাবা প্রকাণ্ড এক চড় তুলিতেছিলেন, কিন্তু ভোলানাথের ফ্যাকাশে মুখখানা দেখিবার পর সে চড় আর তাহার গালে নামে নাই।

নানাজনে জেরা করিয়া তাহার কাছে যে সমস্ত কথা আদায় করিয়াছেন, তাহা শুনিয়াই আমরা তাহার আটকা পড়িবার বর্ণনাটা দিলাম। কিন্তু আমাদের কাছে এত কথা কবুল করে নাই। আমাদের সে আরও উল্টা বুঝাইতে চাহিয়াছিল যে, সে ইচ্ছা করিয়াই বাহাদুরির জন্যে কলেজবাড়িতে রাত কাটাইবার চেষ্টায় ছিল। যখন সে দেখিল যে, তাহার সে কথা কেহ বিশ্বাস করে না, বরং আসল কথাটা ক্রমেই ফাঁস হইয়া পড়িতেছে, তখন সে এমন মুষড়াইয়া গেল যে, অন্তত মাস তিনেকের জন্য তাহার সর্দারির অভ্যাসটা বেশ একটু দমিয়া পড়িয়াছিল।

# ব্যোমকেশের মাঞ্জা

'টোকিয়ো—কিয়োটো—নাগাসাকি—য়োকোহামা'—বোর্ডের উপর প্রকাণ্ড ম্যাপ ঝুলিয়ে হারাণচন্দ্র জাপানের প্রধান নগরগুলি দেখিয়ে যাচ্ছে। এর পরেই ব্যোমকেশের পালা কিন্তু ব্যোমকেশের সে খেয়ালই নেই। কাল বিকেলে ডাক্তারবাবুর ছোট্ট ছেলেটার সঙ্গে প্যাঁচ খেলতে গিয়ে তার দুটো-দুটো ঘুড়ি কাটা গিয়েছিল, সে-কথাটা ব্যোমকেশ কিছুতেই আর ভুলতে পারছে না। তাই সে বসে বসে সুতোর জন্যে কড়া রকমের একটা মাঞ্জা তৈরির উপায় চিন্তা করছে। চীনে শিরিস গালিয়ে, তার মধ্যে বোতলচুর আর কড়কড়ে এমেরি পাউডার মিশিয়ে সুতোয় মাখালে পর কি রকম চমৎকার মাঞ্জা হবে, সেই কথা ভাবতে ভাবতে উৎসাহে তার দুই চোখ কড়িকাঠের দিকে গোল হয়ে উঠছে। মনে মনে মাঞ্জা দেওয়া ঘুড়ির সুতোটা সবে তালগাছের আগা পর্যন্ত উঠে, আশ্চর্য কায়দায় ডাক্তারের ছেলের ঘুড়িটাকে কাটতে যাচ্ছে এমন সময়ে গম্ভীর গলায় ডাক পড়ল—"তারপর, ব্যোমকেশ এস দেখি।"

ঐ রকম ভীষণ উত্তেজনার মধ্যে, সুতো-মাঞ্জা, ঘুড়ির প্যাঁচ সব ফেলে আকাশের উপর থেকে ব্যোমকেশকে হঠাৎ নেমে আসতে হল একেবারে চীন দেশের মধ্যিখানে। একে তো ও দেশটার সঙ্গে তার পরিচয় খুব বেশি ছিল না, তার উপর যা-ও দু-একটা চীনদেশী নাম সে জানত, ওরকম হঠাৎ নেমে আসবার দরুন, সেগুলোও তার মাথার মধ্যে কেমন বিচ্ছিরি রকম ঘন্ট পাকিয়ে গেল। পাহাড়, নদী, দেশ, উপদেশের মধ্যে ঢুকতে না ঢুকতে বেচারা বেমালুম পথ হারিয়ে ফেলল। তার কেবলই মনে হতে লাগল যে চীনদেশের চীনে শিরীষ, তাই দিয়ে হয় মাঞ্জা। মাস্টারমশাই দু-দুবার তাড়া দিয়ে যখন তৃতীয়বার চড়া গলায় বললেন, "চীন দেশের নদী দেখাও" তখন বেচারা একেবারেই দিশেহারা আর মরিয়া মতন হয়ে বললে—"সাংহাই।" সাংহাই বলবার আর কোনো কারণ ছিল না, বোধ হয় তার সেজমামার যে স্ট্যাম্প সংগ্রহের খাতা আছে তার মধ্যে ঐ নামটাকে সে পেয়ে থাকবে—বিপদের ধাক্কায় হঠাৎ কেমন করে ঐটেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

গোটা দুই চড়-চাপড়ের পর ব্যোমকেশবাবু তাঁর কানের উপর মাস্টারমশায়ের প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে, বিনা আপত্তিতে বেঞ্চের উপর আরোহণ করলেন। কিন্তু কানদুটো জুড়োতে না জুড়োতেই মনটা তার খেই-হারানো ঘুড়ির পিছনে উধাও হয়ে, আবার সুতোর মাঞ্জা তৈরি করতে বসল। সারাটা দিন বকুনি খেয়েই তার সময় কাটল, কিন্তু এর মধ্যে কত উঁচুদরের মাঞ্জা-দেওয়া সুতো তৈরি হল আর কত যে ঘুড়ি গন্ডায় গন্ডায় কাটা পড়ল সে জানে কেবল ব্যোমকেশ।

বিকেলবেলায় সবাই যখন বাড়ি ফিরছে, তখন ব্যামকেশ দেখল, ডাক্তারের ছেলেটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মস্ত একটা লাল রঙের ঘুড়ি কিনছে। দেখে ব্যোমকেশ বন্ধু

পাঁচকড়িকে বলল, "দেখেছিস, পাঁচু, আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে আবার ঘুড়ি কেনা হচ্ছে! এ-সব কিন্তু নেহাত বাড়াবাড়ি। না হয় দুটো ঘুড়িই কেটেছিস বাপু, তার জন্যে এত কি গিরিস্বাড়ি!" এই ব'লে · কাছে তার মাঞ্জা তৈরির মতলবটা খুলে বলল। শুনে পাঁচু গম্ভীর হয়ে বল.., 'তা যদি বলিস, তুই আর মাঞ্জা তৈরি করে ওদের সঙ্গে পারবি ভেবেছিস্? ওরা হল ডাক্তারের ছেলে, নানা রকম ওষুধ-মশলা জানে। এই তো সেদিন ওর দাদাকে দেখলুম, শানের উপর কি একটা আরক ঢেলে দিলে, আর ভস্‌ভস্ করে গ্যাঁজালের মতো তেজ বেরুতে লাগল। ওরা যদি মাঞ্জা বানায়, তা হলে কারু মাঞ্জার সাধ্যি নেই যে তার সঙ্গে পেরে ওঠে।" শুনে ব্যোমকেশের মনটা কেমন দমে গেল। তার ধ্রুব রকম বিশ্বাস হল যে, ডাক্তারের ছেলেটা নিশ্চয় কোনো আশ্চর্য রকম মাঞ্জার খবর জানে। তা নইলে ব্যোমকেশের চাইতেও চার বছরের ছোট হয়ে, সে কেমন করে তার ঘুড়ি কাটল? ব্যোমকেশ স্থির করল, যেমন করে হোক ওদের বাড়ির মাঞ্জা খানিকটা যোগাড় করতেই হবে। সেটা একবার আদায় করতে পারলে, তারপর সে ডাক্তারের ছেলেকে দেখে নেবে।

বাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি জলখাবার সেরে নিয়ে ব্যোমকেশ দৌড়ে গেল ডাক্তারবাবুর ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করতে। সেখানে গিয়ে সে দেখে কি, কোণের বারান্দায় বসে সেই ছোট্ট ছেলেটা একটা ডাক্তারি থলের মধ্যে কি যেন মশলা ঘুঁটছে। ব্যোমকেশকে দেখে সে একটা চৌকির তলায় সব লুকিয়ে ফেলে সেখান থেকে সরে পড়ল। ব্যোমকেশ মনে মনে বললে, 'বাপু হে! এখন আর লুকিয়ে করবে কি? তোমার আসল খবর আমি পেয়েছি'—এই ব'লে সে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলে, কোথাও কেউ নেই। একবার সে ভাবল, কেউ আস্‌লে এর একটুখানি চেয়ে নেব। আবার মনে হল, কি জানি চাইলে যদি না দেয়? তারপর ভাবলে, দূর! ভারি তো জিনিস তা আবার চাইবার দরকার কি? এই একটুকু মাঞ্জা হলেই প্রায় দুশো গজ সুতোয় শান দেওয়া হবে। এই ভেবে সে চৌকির তলা থেকে এক খাবলা মশলা তুলে নিয়েই এক দৌড়ে বাড়ি এসে হাজির।

আর কি তখন দেরি সয়? দেখতে দেখতে দক্ষিণের বারান্দা জুড়ে সুতো খাটিয়ে, মহা উৎসাহে মাঞ্জা দেওয়া শুরু হল। যাই বল, মাঞ্জাটা কিন্তু ভারি অদ্ভুত—কই, তেমন কড়কড়ু করছে না তো! বোধ হয়, খুব মিহি গুঁড়োর তৈরি—আর কালো কাচের গুঁড়ো। দুঃখের বিষয়, বেচারার কাজটা শেষ না হতেই সন্ধ্যা হয়ে এল, আর তার বড়দা এসে বললে, "যা, যা! আর সুতো পাকাতে হবে না, এখন পড়গে যা।"

সে রাত্তিরে ব্যোমকেশের ভালো করে ঘুমই হল না। সে স্বপ্ন দেখল যে, ডাক্তারের ছেলেটা হিংসে করে তার চমৎকার সুতোয় জল ফেলে সব নষ্ট করে দিয়েছে। সকাল হতে না হতেই ব্যোমকেশ দৌড়ে গেল তার সুতোর খবর নিতে। কিন্তু গিয়েই দেখে,

কে এক বুড়ো ভদ্রলোক ঠিক বারান্দার দরজার সামনে বসে তার দাদার সঙ্গে গল্প করছেন, তামাক খাচ্ছেন। ব্যোমকেশ ভাবলে, দেখ তো কি অন্যায়! এর মধ্যে থেকে এখন সুতোটা আনি কেমন করে? যাহোক, অনেকক্ষণ ইতস্তত করে সে খুব সাহসের সঙ্গে গিয়ে, চট করে তার সুতো খুলে নিয়ে চলে আসছে—এমন সময়, হঠাৎ কাশতে গিয়ে বুড়ো লোকটির কল্‌কে থেকে খানিকটা টিকে গেল মাটিতে পড়ে। বৃদ্ধ তখন ব্যস্ত হয়ে হাতের কাছে কিছু না পেয়ে, ব্যোমকেশের সেই মাঞ্জা-মাখানো কাগজটা দিয়ে টিকেটাকে তুলতে গেলেন।

সর্বনাশ! যেমন টিকের উপর কাগজ ছোঁয়ানো, অমনি কিনা ভস্‌ভস্‌ করে কাগজ জ্বলে ওঠে ভদ্রলোকের আঙুল-টাঙুল পুড়ে, বারান্দার বেড়ায় আগুন-টাগুন লেগে এক হুলুস্থুল কান্ড! অনেক চেঁচামেচি ছুটোছুটি আর জল ঢালাঢালির পর যখন আগুনটা নিভে এল, আর ভদ্রলোকের আঙুলের ফোস্কায় মলম দেয়া হল, তখন তার দাদা এসে তার কান ধরে বললেন, "হতভাগা! কি রেখেছিলি কাগজের মধ্যে বল্‌ তো?" ব্যোমকেশ কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে, "কিচ্ছু তো রাখিনি, খালি সুতোর মাঞ্জা রেখেছিলাম।" দাদা তার কৈফিয়ৎটাকে নিতান্তই আজগুবি মনে করে, "আবার এয়ার্কি হচ্ছে?" ব'লে বেশ দু-চার ঘা কষিয়ে দিলেন। বেচারা ব্যোমকেশ এই ব'লে তার মনকে খুব খানিক সান্ত্বনা দিল যে, আর যাই হোক, তার সুতোটুকু রক্ষা পেয়েছে। ভাগ্যিস সে সময়মতো খুলে এনেছিল, নইলে তার সুতোও যেত, পরিশ্রমও নষ্ট হত।

বিকেলে সে বাড়ি এসেই চটপট ঘুড়ি আর লাটাই নিয়ে ছাতের উপর উঠল। মনে মনে বলল, 'ডাক্তারের পো আজ একবার আসুক না, দেখিয়ে দেব প্যাঁচ খেলাটা কাকে বলে।' এমন সময়ে পাঁচকড়ি এসে বড় বড় চোখ করে বললে, "শুনেছিস্‌?" ব্যোমকেশ বললে, "না—কি হয়েছে?" পাঁচু বললে, "ওদের সেই ছেলেটাকে দেখে এলুম, সে নিজে নিজে দেশলাইয়ের মশলা বানিয়েছে, আর চমৎকার লাল নীল দেশলাই তৈরি করছে।" ব্যোমকেশ হঠাৎ লাটাই-টাটাই রেখে, এত বড় হাঁ করে জিগ্‌গেস করলে, "দেশলাই কিরে! মাঞ্জা বল?" শুনে পাঁচু বেজায় চটে গেল, "বলছি লাল নীল আলো জ্বলছে, তবু বলবে মাঞ্জা, আচ্ছা গাধা যা হোক!"

ব্যোমকেশ কোনো জবাব না দিয়ে, দেশলাইয়ের মশলা-মাখানো সুতোটার দিকে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে রইল। সেই সময় ডাক্তারদের বাড়ি থেকে লাল রঙের ঘুড়ি উড়ে এসে, ঠিক ব্যোমকেশের মাথার উপর ফর্‌ফর্‌ করে তাকে যেন ঠাট্টা করতে লাগল। তখন সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। বলল, "আমার অসুখ করেছে।"

# চালিয়াৎ

শ্যামচাঁদের বাবা কোন একটা সাহেব-অফিসে মস্ত বড় কাজ করিতেন, তাই শ্যামচাঁদের পোশাক পরিচ্ছদে, রকম-সকমে কায়দার আর অন্ত ছিল না। সে যখন দেড় বিঘৎ চওড়া কলার আঁটিয়া, রঙিন ছাতা মাথায় দিয়া, নতুন জুতার মচ্‌মচ্‌ শব্দে গম্ভীর চালে ঘাড় উঁচাইয়া স্কুলে আসিত, তাহার সঙ্গে পাগড়িবাঁধা তক্‌মা-আঁটা চাপরাশি এক রাজ্যের বই ও টিফিনের বাক্স বহিয়া আনিত, তখন তাহাকে দেখাইত ঠিক যেন পেখমধরা ময়ূরটির মতো! স্কুলের ছোট ছোট ছেলেরা হাঁ করিয়া অবাক হইয়া থাকিত, কিন্তু আমরা সবাই একবাক্যে বলিতাম "চালিয়াৎ"।

বয়সের হিসাবে শ্যামচাঁদ একটু বেঁটে ছিল। পাছে কেহ তাকে ছেলেমানুষ ভাবে, এবং যথোপযুক্ত খাতির না করে, এই জন্য সর্বদাই সে অত্যন্ত বেশি রকম গম্ভীর হইয়া থাকিত এবং কথাবার্তায় নানা রকম বোলচাল দিয়া এমন বিজ্ঞের মতো ভাব প্রকাশ করিত যে স্কুলের দারোয়ান হইতে নিচের ক্লাশের ছাত্র পর্যন্ত সকলেই ভাবিত, 'নাঃ, লোকটা কিছু জানে!' শ্যামচাঁদ প্রথমে যেবার ঘড়ি-চেইন আঁটিয়া স্কুলে আসিল, তখন তাহার কান্ড যদি দেখিতে! পাঁচ মিনিট অন্তর ঘড়িটাকে বাহির করিয়া সে কানে দিয়া শুনিত, ঘড়িটা চলে কিনা! স্কুলের যেখানে যত ঘড়ি আছে, সব কটার ভুল তাহার দেখানো চাই-ই চাই! পাঁড়েজি দারোয়ানকে রীতিমতো ধমক্‌ লাগাইয়া বলিত, "এইও! স্কুলের ক্লক্‌টাতে যখন চাবি দাও, তখন সেটাকে রেগুলেট কর না কেন? ওটাকে অয়েল করতে হবে—ক্রমাগতই শ্লো চলছে।" পাঁড়েজির চৌদ্দ পুরুষে কেউ কখনও ঘড়ি 'অয়েল' বা 'রেগুলেট' করে নাই। সে যে সপ্তাহে একদিন করিয়া চাবি ঘুরাইতে শিখিয়াছে, ইহাতেই তাহার দেশের লোকের বিস্ময়ের সীমা নাই। কিন্তু দেশভাইদের কাছে মানরক্ষা করিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "হাঁ, হাঁ, আভি হাম্‌ রেংলিট কর্‌বে।" পাঁড়েজির উপর একচাল চালিয়া শ্যামচাঁদ ক্লাশে ফিরিতেই এক পাল ছোট ছেলে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। শ্যামচাঁদ তাহাদের কাছে মহা আড়ম্বর করিয়া শ্লো, ফাস্ট, মেইন স্প্রিং, রেগুলেট প্রভৃতি ঘড়ির সমস্ত রহস্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিল।

একবার আমাদের একটি নতুন মাস্টার ক্লাশে আসিয়াই শ্যামচাঁদকে 'খোকা' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। লজ্জায় ও অপমানে শ্যামচাঁদের মুখ কান একেবারে লাল হইয়া উঠিল—সে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, আমার নাম শ্যামচাঁদ ঘটক।" মাস্টার মহাশয় অত কি বুঝিবেন, বলিলেন, "শ্যামচাঁদ? আচ্ছা বেশ, খোকা বস।" তারপর কয়েকদিন ধরিয়া স্কুল সুদ্ধ ছেলে তাহাকে 'খোকা' 'খোকা' করিয়া অস্থির করিয়া তুলিল। কিন্তু কয়দিন পরেই শ্যামচাঁদ ইহার শোধ লইয়া ফেলিল। সেদিন সে ক্লাশে আসিয়াই পকেট হইতে কালো চোঙ্গার মতো কি একটা বাহির করিল।

সে ক্লাশে আসিয়াই পকেট হইতে কালো চোঙ্গার মতো কি একটা বাহির করিল। মাস্টার মহাশয়, শাদাসিধে ভালোমানুষ, তিনি বলিলেন, "কি হে খোকা, থার্‌মোমিটার এনেছ যে! জ্বর-টর হয় নাকি?" শ্যামচাঁদ বলিল, "আজ্ঞে, না—থারমোমিটার নয়—ফাউন্টেন পেন!" শুনিয়া সকলের তো চক্ষু স্থির। ফাউন্টেন পেন! মাস্টার এবং ছেলে সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিতে আসিলেন ব্যাপারখানা কি! শ্যামচাঁদ বলিল, "এই একটা ভাল্‌কেনাইট্ টিউব, তার মধ্যে কালি ভরা আছে।" একটা ছেলে উৎসাহে বলিয়া উঠিল, "ও বুঝেছি, পিচকিরি বুঝি?" শ্যামচাঁদ কিছু জবাব না দিয়া, খুব মাতব্বরের মতো একটুখানি মুচকি হাসিয়া, কলমটিকে খুলিয়া তাহার সোনালি নিবখানি দেখাইয়া বলিল, "ওতে ইরিডিয়াম আছে—সোনার চেয়েও বেশি দাম।" তারপর যখন সে একখানা খাতা লইয়া, সেই আশ্চর্য কলম দিয়া তর্‌তর্ করিয়া নিজের নাম লিখিতে লাগিল, তখন স্বয়ং মাস্টার মহাশয় পর্যন্ত বড় বড় চোখ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তারপর, শ্যামচাঁদ কলমটিকে তাঁর হাতে দিবামাত্র তিনি ভারি খুশি হইয়া সেটাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দুই ছত্র লিখিয়া বলিলেন, "কি কলমই বানিয়েছে, বিলিতি কোম্পানি বুঝি?" শ্যামচাঁদ চট্‌পট্ বলিয়া ফেলিল, "আমেরিকান স্টাইলো এন্ড ফাউন্টেন পেন কো, ফিলাডেল্‌ফিয়া।"

ক্রমে পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল। ছুটির দিন স্কুলের উদ্যানে প্রকান্ড শামিয়ানা খাটানো হইল, কলিকাতা হইতে কে এক বাজিওয়ালা আসিয়াছেন, তিনি ম্যাজিক দেখাইবেন। যথাসময়ে সকলে আসিলেন, মাস্টার ছাত্র লোকজন নিমন্ত্রিত অভ্যাগত সকলে মিলিয়া উঠান সিঁড়ি রেলিং পাঁচিল একেবারে ভরিয়া ফেলিয়াছে। ম্যাজিক চলিতে লাগিল। একখানা শাদা রুমাল চোখের সামনেই লাল নীল সবুজের কারিকুরিতে রঙিন হইয়া উঠিল। একজন লোক একটা সিদ্ধ ডিম গিলিয়া মুখের মধ্য হইতে এগারোটি আস্ত ডিম বাহির করিল। ডেপুটিবাবুর কোচম্যানের দাড়ি নিংড়াইয়া প্রায় পঞ্চাশটি টাকা বাহির করা হইল। তারপর ম্যাজিকওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল "কারও কাছে ঘড়ি আছে?" শ্যামচাঁদ তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আমার ঘড়ি আছে।' ম্যাজিকওয়ালা তাহার ঘড়িটি লইয়া খুব গম্ভীরভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। ঘড়িটির খুব প্রশংসা করিয়া বলিল, "তোফা ঘড়ি তো !" তারপর চেনশুদ্ধ ঘড়িটাকে একটা কাগজে মুড়িয়া, একটা হামানদিস্তায় দমাদম্ ঠুকিতে লাগিল। তারপর কয়েক টুকরা ভাঙা লোহা আর কাঁচ দেখাইয়া শ্যামচাঁদকে বলিল, "এটাই কি তোমার ঘড়ি?" শ্যামচাঁদের অবস্থা বুঝিতেই পার ! সে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল, দু-তিন বার কি যেন বলিতে গিয়া আবার থামিয়া গেল। শেষটায় অনেক কষ্টে একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া, রুমাল দিয়া ঘাম মুছিতে মুছিতে বসিয়া পড়িল। যাহা হউক, খানিক বাদে যখন একখানা পাঁউরুটির মধ্যে ঘড়িটাকে আস্ত অবস্থায় পাওয়া গেল

তখন চালিয়াৎ খুব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, যেন তামাশাটা সে আগাগোড়াই বুঝিতে পারিয়াছে।

সব শেষে ম্যাজিকওয়ালা নানাজনের কাছে নানারকম জিনিস চাহিয়া লইল—চশমা, আংটি, মনিব্যাগ, রূপার পেনসিল প্রভৃতি আট-দশটি জিনিস সকলের সামনে এক সঙ্গে পোঁটলা বাঁধিয়া, শ্যামচাঁদকে ডাকিয়া তাহার হাতে পোঁটলাটি দেওয়া হইল। শ্যামচাঁদ বুক ফুলাইয়া পোঁটলা হাতে দাঁড়াইয়া রহিল আর ম্যাজিকওয়ালা লাঠি ঘুরাইয়া, চোখ-টোখ পাকাইয়া, বিড়-বিড় করিয়া কি সব বকিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ শ্যামচাঁদের দিকে ভ্রুকুটি করিয়া বলিল, "জিনিসগুলো ফেললে কোথায়?" শ্যামচাঁদ পোঁটলা দেখাইয়া বলিল, "এই যে।" ম্যাজিকওয়ালা মহা খুশি হইয়া বলিল, "সাবাস ছেলে ! দাও, পোঁটলা খুলে যার যার জিনিস ফেরত দাও।" শ্যামচাঁদ তাড়াতাড়ি পোঁটলা খুলিয়া দেখে, তাহার মধ্যে খালি কয়েক টুকরো কয়লা আর ঢিল ! তখন ম্যাজিকওয়ালার তম্বি দেখে কে? সে কপালে হাত ঠুকিয়া বলিতে লাগিল, "হাঁয়, হায়, আমি ভদ্রলোকের কাছে মুখ দেখাই কি করে? কেনই বা ওর কাছে দিতে গেছিলাম ? ওহে, ওসব তামাশা এখন রাখ, আমার জিনিসগুলো এবার ফিরিয়ে দাও দেখি ?" শ্যামচাঁদ হাসিবে কি কাঁদিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না—ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল। তখন ম্যাজিকওয়ালা তাহার কানের মধ্য হইতে আংটি, চুলের মধ্যে পেনসিল, আস্তিনের মধ্যে চশমা—এইরূপে একটি জিনিস উদ্ধার করিতে লাগিল। আমরা হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলাম—শ্যামচাঁদও প্রাণপণে হাসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সমস্ত জিনিসের হিসাব মিলাইয়া ম্যাজিক-ওয়ালা যখন তাহাকে বলিল, "আর কি নিয়েছ?" তখন সে বাস্তবিকই ভয়ানক রাগিয়া বলিল, "ফের মিছে কথা ! কখনো আমি কিছু নিইনি।" তখন ম্যাজিকওয়ালা তাহার কোটের পিছন হইতে জ্যান্ত একটা পায়রা বাহির করিয়া বলিল, "এটা বুঝি কিছু নয়?"

এবার শ্যামচাঁদ একেবারে ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তারপর পাগলের মতো হাত পা ছুঁড়িয়া সভা হইতে ছুটিয়া বাহির হইল। আমরা সবাই আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া চেঁচাইতে লগিলাম—চালিয়াৎ ! চালিয়াৎ !

# ডিটেক্‌টিভ

জলধরের মামা পুলিশের চাকরি করেন, আর তার পিসেমশাই লেখেন ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। সেইজন্য জলধরের বিশ্বাস যে, চোর-ডাকাত জাল-জুয়াচোর জব্দ করবার সব রকম সঙ্কেত সে যেমন জানে এমনি তার মামা আর পিসেমশাই ছাড়া কেউ জানে না। কারও বাড়িতে চুরি-টুরি হলে জলধর সকলের আগে সেখানে হাজির হয়। আর, কে চুরি করল, কি করে চুরি হল, সে থাকলে এমন অবস্থায় কি করত, এ-সব বিষয়ে খুব বিজ্ঞের মতো কথা বলতে থাকে। যোগেশবাবুর বাড়িতে যখন বাসন চুরি হল, তখন জলধর তাদের বললে, "আপনারা একটুও সাবধান হতে জানেন না, চুরি তো হবেই। দেখুন তো ভাঁড়ার ঘরের পাশেই অন্ধকার গলি। তার উপর জানলার গরাদ নেই। একটু সেয়ানা লোক হলে এখান দিয়ে বাসন নিয়ে পালাতে কতক্ষণ? আমাদের বাড়িতে ও-সব হবার জো নেই। আমি রামদিনকে ব'লে রেখেছি, জানলার গায়ে এমনভাবে বাসনগুলো ঠেকিয়ে রাখবে যে জানালা খুলতে গেলেই বাসনপত্র সব ঝন্‌ঝন্‌ করে মাটিতে পড়বে। চোর জব্দ করতে হলে এ-সব কায়দা জানতে হয়।" সে সময়ে আমরা সকলেই জলধরের বুদ্ধির খুব প্রশংসা করেছিলাম, কিন্তু পরের দিন যখন শুনলাম সেই রাত্রে জলধরের বাড়িতে মস্ত চুরি হয়ে গেছে, তখন মনে হল, আগের দিন অতটা প্রশংসা করা উচিত হয়নি। জলধর কিন্তু তাতেও কিছুমাত্র দমেনি। বলল, "ঐ আহাম্মক রামদিনটার বোকামিতে সব মাটি হয়ে গেল। যাক্‌, আমার জিনিস চুরি করে তাকে আর হজম করতে হবে না। দিন দুচার যেতে দাও না।"

দু মাস গেল, চার মাস গেল, চোর কিন্তু আর ধরাই পড়ল না। চোরের উপদ্রবের কথা আমরা সবাই ভুলে গেছি, এমন সময় হঠাৎ আমাদের ইস্কুলে আবার চুরির হাঙ্গামা শুরু হল। ছেলেরা অনেকে টিফিন নিয়ে আসে, তা থেকে খাবার চুরি যেতে লাগল। প্রথম দিন রামপদর খাবার চুরি যায়। সে বেঞ্চির উপর খানিকটা রাবড়ি আর লুচি রেখে হাত ধুয়ে আসতে গেছে—এর মধ্যে কে এসে লুচিটুচি বেমালুম খেয়ে গিয়েছে। তারপর ক্রমে আরো দু-চারটি ছেলের খাবার চুরি হল। তখন আমরা জলধরকে বললাম, "কি হে ডিটেক্‌টিভ! এই বেলা যে তোমার চোর-ধরা বুদ্ধি খোলে না, তার মানেটা কি বল দেখি?" জলধর বলল, "আমি কি আর বুদ্ধি খাটাচ্ছি না? সবুর কর না।" তখন সে খুব সাবধানে আমাদের কানে কানে এ কথা জানিয়ে দিল যে, ইস্কুলের যে নতুন ছোকরা বেয়ারা এসেছে তাকেই সে চোর বলে সন্দেহ করে। কারণ, সে আসবার পর থেকে চুরি আরম্ভ হয়েছে। আমরা সবাই সেদিন থেকে তার উপর চোখ রাখতে শুরু করলাম। কিন্তু দুদিন না যেতেই আবার চুরি! পাগলা দাশু বেচারা বাড়ি থেকে মাংসের চপ এনে টিফিন ঘরের বেঞ্চের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল, কে এসে তার আধখানা খেয়ে বাকিটুকু ধুলোয়

বেঞ্চের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল, কে এসে তার আধখানা খেয়ে বাকিটুকু ধুলোয় ফেলে নষ্ট করে দিয়েছে। পাগলা তখন রাগের চোটে চীৎকার করে গাল দিয়ে ইস্কুল-বাড়ি মাথায় করে তুলল। আমরা সবই বললাম, "আরে চুপ্ চুপ্, অত চেঁচাসনে। তা হলে চোর ধরা পড়বে কি করে?" কিন্তু পাগলা কি সে-কথা শোনে? তখন জলধর তাকে বুঝিয়ে বলল, "আর দুদিন সবুর কর, ঐ নতুন ছোকরাটাকে আমি হাতে হাতে ধরিয়ে দিচ্ছি—এ সমস্ত ওরই কারসাজি।" শুনে দাশু বলল, "তোমার যেমন বুদ্ধি! ওরা হল পশ্চিমা ব্রাহ্মণ, ওরা আবার মাংস খায় নাকি? দারোয়ানজীকে জিগ্‌গেষ কর তো?" সত্যিই আমাদের তো সে-খেয়াল হয়নি! ছোকরা তো কতদিন রুটি পাকিয়ে খায়, কই একদিনও তো ওকে মাছ-মাংস খেতে দেখি না। দাশু পাগলা হোক আর যাই হোক, তার কথাটা সবাইকে মানতে হল।

জলধর কিন্তু অপ্রস্তুত হবার ছেলেই নয়। সে এক গাল হেসে বলল, "আমি ইচ্ছে করে তোদের ভুল বুঝিয়েছিলাম। আরে, চোরকে না ধরা পর্যন্ত কি কিছু বলতে আছে, কোনো পাকা ডিটেক্‌টিভ ও-রকম করে না। আমি মনে মনে যাকে চোর বলে ধরেছি, সে আমিই জানি।"

তারপর কদিন আমরা খুব হুঁশিয়ার ছিলাম, আট-দশদিন আর চুরি হয়নি। তখন জলধর বললে, "তোমরা গোলমাল করেই তো সব মাটি করলে। চোরটা টের পেয়ে গেল যে আমি তার পেছনে লেগেছি। আর কি সে চুরি করতে সাহস পায়? তবু ভাগ্যিস তোমাদের কাছে আসল নামটা ফাঁস করিনি।" কিন্তু সেই দিনই আবার শোনা গেল, স্বয়ং হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘর থেকে তার টিফিন খাবার চুরি হয়ে গেছে। আমরা বললাম, "কই হে? চোর না তোমার ভয়ে চুরি করতে পারছিল না? তার ভয় যে ঘুচে গেল দেখছি।"

তারপর দুদিন ধরে জলধরের মুখে আর হাসি দেখা গেল না। চোরের ভাবনা ভেবে ভেবে তার পড়াশুনা এম্নি ঘুলিয়ে গেল যে পন্ডিত মহাশয়ের ক্লাশে সে আরেকটু হলেই মার খেত আর কি! দুদিন পর সে আমাদের সকলকে ডেকে একত্র করল, আর বলল, তার চোর ধরবার বন্দোবস্ত ঠিক হয়েছে। টিফিনের সময় সে একটা ঠোঙায় করে সরভাজা, লুচি আর আলুর দম রেখে চলে আসবে। তারপর কেউ যেন সেদিকে না যায়। ইস্কুলের বাইরে থেকে লুকিয়ে টিফিনের ঘরটা দেখা যায়। আমরা কয়েকজন বাড়ি যাবার ভান করে সেখানে থাকব। আর কয়েকজন থাকবে উঠোনের পশ্চিম কোণের ছোট ঘরটাতে। সুতরাং, চোর যেদিক থেকেই আসুক, টিফিন ঘরে ঢুকতে গেলেই তাকে দেখা যাবে।

ফেলে নষ্ট করে দিয়েছে। পাগলা তখন রাগের চোটে চীৎকার করে গাল দিয়ে ইস্কুল-বাড়ি মাথায় করে তুলল। আমরা সবই বললাম, "আরে চুপ্ চুপ্, অত চেঁচাসনে। তা হলে চোর ধরা পড়বে কি করে?" কিন্তু পাগলা কি সে-কথা শোনে? তখন জলধর তাকে বুঝিয়ে বলল, "আর দুদিন সবুর কর, ঐ নতুন ছোকরাটাকে আমি হাতে হাতে ধরিয়ে দিচ্ছি—এ সমস্ত ওরই কারসাজি।" শুনে দাশু বলল, "তোমার যেমন বুদ্ধি! ওরা হল পশ্চিমা ব্রাহ্মণ, ওরা আবার মাংস খায় নাকি? দারোয়ানজীকে জিগ্‌গেষ কর তো?" সত্যিই আমাদের তো সে-খেয়াল হয়নি! ছোকরা তো কতদিন রুটি পাকিয়ে খায়, কই একদিনও তো ওকে মাছ-মাংস খেতে দেখি না। দাশু পাগলা হোক আর যাই হোক, তার কথাটা সবাইকে মানতে হল।

জলধর কিন্তু অপ্রস্তুত হবার ছেলেই নয়। সে এক গাল হেসে বলল, "আমি ইচ্ছে করে তোদের ভুল বুঝিয়েছিলাম। আরে, চোরকে না ধরা পর্যন্ত কি কিছু বলতে আছে, কোনো পাকা ডিটেক্‌টিভ ও-রকম করে না। আমি মনে মনে যাকে চোর বলে ধরেছি, সে আমিই জানি।"

তারপর কদিন আমরা খুব হুঁশিয়ার ছিলাম, আট-দশদিন আর চুরি হয়নি। তখন জলধর বললে, "তোমরা গোলমাল করেই তো সব মাটি করলে। চোরটা টের পেয়ে গেল যে আমি তার পেছনে লেগেছি। আর কি সে চুরি করতে সাহস পায়? তবু ভাগ্যিস তোমাদের কাছে আসল নামটা ফাঁস করিনি।" কিন্তু সেই দিনই আবার শোনা গেল, স্বয়ং হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘর থেকে তার টিফিন খাবার চুরি হয়ে গেছে। আমরা বললাম, "কই হে? চোর না তোমার ভয়ে চুরি করতে পারছিল না? তার ভয় যে ঘুচে গেল দেখছি।"

তারপর দুদিন ধরে জলধরের মুখে আর হাসি দেখা গেল না। চোরের ভাবনা ভেবে ভেবে তার পড়াশুনা এম্নি ঘুলিয়ে গেল যে পন্ডিত মহাশয়ের ক্লাশে সে আরেকটু হলেই মার খেত আর কি! দুদিন পর সে আমাদের সকলকে ডেকে একত্র করল, আর বলল, তার চোর ধরবার বন্দোবস্ত ঠিক হয়েছে। টিফিনের সময় সে একটা ঠোঙায় করে সরভাজা, লুচি আর আলুর দম রেখে চলে আসবে। তারপর কেউ যেন সেদিকে না যায়। ইস্কুলের বাইরে থেকে লুকিয়ে টিফিনের ঘরটা দেখা যায়। আমরা কয়েকজন বাড়ি যাবার ভান করে সেখানে থাকব। আর কয়েকজন থাকবে উঠোনের পশ্চিম কোণের ছোট ঘরটাতে। সুতরাং, চোর যেদিক থেকেই আসুক, টিফিন ঘরে ঢুকতে গেলেই তাকে দেখা যাবে।

সেদিন টিফিনের ছুটি পর্যন্ত কারও আর পড়ায় মন বসে না। সবাই ভাবছে কতক্ষণে ছুটি হবে, আর চোর কতক্ষণে ধরা পড়বে। চোর ধরা পড়লে তাকে নিয়ে কি করা যাবে, সে বিষয়েও কথাবার্তা হতে লাগল। মাস্টারমশাই বিরক্ত হয়ে ধমকাতে লাগলেন, পরেশ আর বিশ্বনাথকে বেঞ্চির উপর দাঁড়াতে হল—কিন্তু সময়টা যেন কাটতেই চায় না। টিফিনের ছুটি হতেই জলধর তার খাবারের ঠোঙাটা টিফিন-ঘরে রেখে এলো। জলধর, আমি আর দশ-বারোজন উঠোনের কোণের ঘরে রইলাম, আর একদল ছেলে বাইরে জিমনাস্টিকের ঘরে লুকিয়ে থাকল। জলধর বলল, "দেখ, চোরটা যে রকম সেয়ানা দেখছি, আর তার যে রকম সাহস, তাকে মারধর করা ঠিক হবে না। লোকটা নিশ্চয় খুব ষন্ডা হবে। আমি বলি, সে যদি এদিকে আসে তাহলে সবাই মিলে তার গায়ে কালি ছিটিয়ে দেব আর চেঁচিয়ে উঠব। তাহলে দারোয়ান-টারোয়ান সব ছুটে আসবে। আর, লোকটা পালাতে গেলেও ঐ কালির চিহ্ন দেখে ঠিক ধরা যাবে।" আমাদের রামপদ ব'লে উঠল, "কেন? সে যে খুব ষন্ডা হবে তার মানে কি? সে কিছু রাক্ষসের মতো খায় বলে তো মনে হয় না। যা চুরি করে নিচ্ছে সে তো কোনো দিনই খুব বেশি নয়।" জলধর বলল, "তুমিও যেমন পন্ডিত। রাক্ষসের মতো খানিকটা খেলেই বুঝি ষন্ডা হয়? তাহলে তো আমাদের শ্যামাদাসকেই সকলের চেয়ে ষন্ডা বলতে হয়। সেদিন ঘোষেদের নেমতন্নে ওর খাওয়া দেখেছিলে তো! বাপু হে, আমি যা বলেছি তার উপর ফোড়ন দিতে যেও না। আর তোমার যদি নেহাৎ বেশি সাহস থাকে, তুমি গিয়ে চোরের সঙ্গে লড়াই কর। আমরা কেউ তাতে আপত্তি করব না। আমি জানি, এ-সমস্ত নেহাৎ যেমন-তেমন চোরের সাধ্য নয়। আমার খুব বিশ্বাস, যে লোকটা আমাদের বাড়িতে চুরি করেছিল—এ-সব তারই কান্ড!"

এমন সময় হঠাৎ টিফিন-ঘরের বাঁ দিকের জানলাটা খানিকটা ফাঁক হয়ে গেল, যেন কেউ ভিতর থেকে ঠেলছে। তার পরেই শাদা মতন কি একটা ঝুপ করে উঠোনের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। আমরা চেয়ে দেখলাম, একটা মোটা হুলো বেড়াল—তার মুখে জলধরের সরভাজা! তখন যদি জলধরের মুখখানা দেখতে, সে এক বিঘৎ উঁচু হাঁ করে উঠোনের দিকে তাকিয়ে রইল। আমরা জিগ্‌গেস করলাম, "কেমন হে ডিটেক্‌-টিভ! ঐ ষন্ডা চোরটাই তো তোমার বাড়িতে চুরি করেছিল? তাহলে এখন ওকেই পুলিশে দিই?"

# দ্রিঘাংচু

এক ছিল রাজা।

রাজা একদিন সভায় বসেছেন—চারিদিকে তাঁর পাত্রমিত্র আমির ওম্‌রা সিপাই শান্ত্রী গিজ্ গিজ্ করছে—এমন সময় কোথা থেকে একটা দাঁড়কাক উড়ে এসে সিংহাসনের ডান দিকে উঁচু থামের উপর ব'সে ঘাড় নিচু ক'রে চারদিক তাকিয়ে, অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বলল, "কঃ"।

কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ এ রকম গম্ভীর শব্দ—সভাসুদ্ধ সকলের চোখ এক সঙ্গে গোল হয়ে উঠল—সকলে একবারে একসঙ্গে হাঁ ক'রে রইল। মন্ত্রী এক তাড়া কাগজ নিয়ে কি যে বোঝাতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ বক্তৃতার খেই হারিয়ে তিনি বোকার মতো তাকিয়ে রইলেন। দরজার কাছে একটা ছেলে বসেছিল, সে হঠাৎ ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে উঠল, যে লোকটা চামর দোলাচ্ছিল, চামরটা তার হাত থেকে ঠাঁই ক'রে রাজার মাথার উপর পড়ে গেল। রাজা মশাইয়ের চোখ ঘুমে ঢুলে এসেছিল, তিনি হঠাৎ জেগে উঠেই বললেন, "জল্লাদ ডাক।"

বলতেই জল্লাদ এসে হাজির। রাজা মশাই বললেন, "মাথা কেটে ফেল।" সর্বনাশ! কার মাথা কাটতে বলে; সকলে ভয়ে ভয়ে নিজের নিজের মাথায় হাত বুলাতে লাগল। রাজা মশায় খানিকক্ষণ ঝিমিয়ে আবার তাকিয়ে বললেন, "কই মাথা কই?" জল্লাদ বেচারা হাত জোড় ক'রে বলল, "আজ্ঞে মহারাজ, কার মাথা?" রাজা বললেন, "বেটা গোমুখ্যু কোথাকার, কার মাথা কিরে! যে ঐ রকম বিট্‌কেল শব্দ করেছিল, তার মাথা।" শুনে সভাসুদ্ধ সকলে হাঁফ ছেড়ে এমন ভয়ানক নিশ্বাস ফেলল যে, কাকটা হঠাৎ ধড়ফড় ক'রে সেখান থেকে উড়ে পালাল।

তখন মন্ত্রীমশাই রাজাকে বুঝিয়ে বললেন ঐ কাকটাই ওরকম আওয়াজ করেছিল! তখন রাজা মশাই বললেন, "ডাকো, পন্ডিত সভার যত পন্ডিত সবাইকে।" হুকুম হওয়া মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে রাজ্যের যত পন্ডিত সব সভায় এসে হাজির।

তখন রাজা মশাই পন্ডিতদের জিজ্ঞাসা করলেন, "এই যে একটা কাক এসে আমার সভার মধ্যে আওয়াজ ক'রে গোল বাধিয়ে গেল, এর কারণ কিছু বলতে পার?"

কাক আওয়াজ করল তার আবার কারণ কি! পন্ডিতেরা সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। একজন ছোকরা মতো পন্ডিত খানিকক্ষণ কাঁচুমাচু ক'রে জবাব দিল,—"আজ্ঞে, বোধ হয় তার খিদে পেয়েছিল।"

রাজা মশাই বললেন, "তোমার যেমন বুদ্ধি! খিদে পেয়েছিল, তা সভার মধ্যে আসতে যাবে কেন? এখানে কি মুড়ি মুড়কি বিক্রি হয়! মন্ত্রী, ওকে বিদেয় ক'রে দাও—" সকলে মহা তম্বী ক'রে বললে, "হাঁ হাঁ, ঠিক ঠিক, ওকে বিদেয় করুন।"

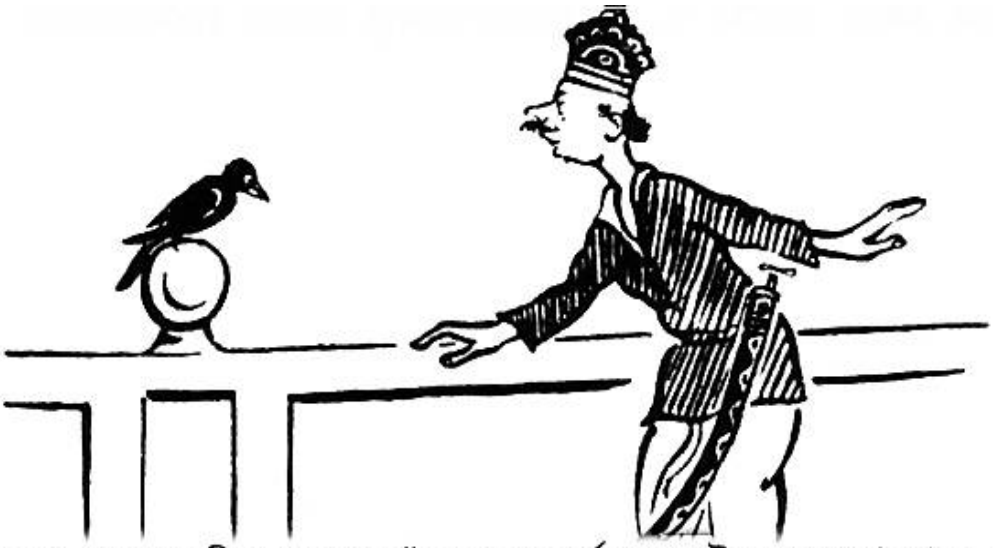

আর একজন পন্ডিত বললেন, "মহারাজ, কার্য থাকলেই তার কারণ আছে—বৃষ্টি হলেই বুঝবে মেঘ আছে, আলো দেখলেই বুঝবে প্রদীপ আছে, সুতরাং বায়স পক্ষীর কণ্ঠনির্গত এই অপরূপ ধ্বনিরূপ কার্যের নিশ্চয়ই কোনো কারণ থাকবে, এতে আশ্চর্য কি?"

রাজা বললেন, "আশ্চর্য এই যে, তোমার মতো মোটা বুদ্ধি লোকেও এই রকম আবোল তাবোল বকে মোটা মোটা মাইনে পাও। মন্ত্রী, আজ থেকে এঁর মাইনে বন্ধ কর।" অমনি সকলে হাঁ হাঁ করে উঠলেন, "মাইনে বন্ধ কর।"

দুই পন্ডিতের এ রকম দুর্দশা দেখে সবাই কেমন ঘাবড়ে গেল। মিনিটের পর মিনিট যায়, কেউ আর কথা কয় না। তখন রাজা মশাই দস্তুরমতো খেপে গেলেন। তিনি হুকুম দিলেন, এর জবাব না পাওয়া পর্যন্ত কেউ যেন সভা ছেড়ে না ওঠে। রাজার হুকুম—সকলে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। ভাবতে ভাবতে কেউ কেউ ঘেমে ঝোল হয়ে উঠল, চুলকিয়ে চুলকিয়ে কারো কারো মাথায় প্রকান্ড টাক পড়ে গেল। বসে বসে সকলের খিদে বাড়তে লাগল—রাজা মশাইয়ের খিদেও নেই, বিশ্রামও নেই—তিনি বসে বসে ঝিমুতে লাগলেন।

সকলে যখন হতাশ হয়ে এসেছে, আর মনে মনে পন্ডিতদের "মূর্খ অপদার্থ নিষ্কর্মা" ব'লে গাল দিচ্ছে, এমন সময় রোগা সুঁটকো মতো একজন লোক হঠাৎ বিকট চীৎকার ক'রে সভার মাঝখানে পড়ে গেল। রাজা মন্ত্রী পাত্র মিত্র উজির নাজির সবাই ব্যস্ত হয়ে বললেন, "কী হলো, কী হলো?"

তখন অনেক জলের ছিটা পাখার বাতাস আর বলা কওয়ার পর লোকটা কাঁপতে কাঁপতে উঠে বলল, "মহারাজ, সেটা কী দাঁড়কাক ছিল?" সকলে বলল, "হাঁ-হাঁ-হাঁ, কেন বল দেখি?" লোকটা আবার বলল, "মহারাজ, সে কি ঐ মাথার উপর দক্ষিণ দিকে মুখ ক'রে বসেছিল—আর মাথা নিচু ক'রে ছিল, আর চোখ পাকিয়েছিল, আর 'কঃ' ক'রে

শব্দ করেছিল?" সকলে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে বললে, "হাঁ-হাঁ—ঠিক ঐ রকম হয়েছিল।" তাই শুনে লোকটা আবার ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে লাগল—আর বলতে লাগল, "হায়, হায়, সেই সময়ে কেউ আমায় খবর দিল না কেন?"

রাজা বললেন, "তাই তো, একে তোমরা তখন খবর দাওনি কেন?" লোকটাকে কেউই চেনে না, তবু সে কথা বলতে সাহস পেল না, সবাই বললে, "হ্যাঁ, ওকে একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল"—যদিও কেন তাকে খবর দেবে, আর কী খবর দেবে, একথা কেউই বুঝতে পারল না। লোকটা তখন খুব খানিকটা কেঁদে তারপর মুখ বিকৃত ক'রে বলল, "দ্রিঘাংচু"। সে আবার কি! সবাই ভাবল, লোকটা খেপে গেছে।

মন্ত্রী বললেন, "দ্রিঘাঞ্চু কি হে?" লোকটা বলল, "দিঘাঞ্চু নয়, দ্রিঘাংচু।" কেউ কিছু বুঝতে পারল ন—তবু সবাই মাথা নেড়ে বলল, "ও!" তখন রাজা মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, "সে কি রকম হে," লোকটা বলল, "আজ্ঞে আমি মূর্খ মানুষ, আমি কি অত খবর রাখি, ছেলেবেলা থেকে দ্রিঘাংচু শুনে আসছি, তাই জানি দ্রিঘাংচু যখন রাজার সামনে আসে, তখন তাকে দেখতে দেখায় দাঁড়কাকের মতো। সে যখন সভায় ঢোকে, তখন সিংহাসনের ডান দিকের থামের উপর ব'সে মাথা নিচু ক'রে দক্ষিণ দিকে মুখ ক'রে, চোখ পাকিয়ে 'কঃ' ব'লে শব্দ করে। আমি তো আর কিছু জানি না—তবে পন্ডিতেরা যদি জানেন।" পন্ডিতেরা তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে বললেন, "না, না, ওর সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায়নি।"

রাজা বললেন, "তোমায় খবর দেয়নি ব'লে কাঁদছিলে, তুমি থাকলে করতে কী?" লোকটা বলল, "মহারাজ, সে কথা বললে লোকে যদি বিশ্বাস না করে, তাই বলতে সাহস হয় না।"

রাজা বললেন, "যে বিশ্বাস করবে না, তার মাথা কাটা যাবে—তুমি নির্ভয়ে ব'লে ফেল।" সভাসুদ্ধ লোক তাতে হাঁ হাঁ ক'রে সায় দিয়ে উঠল।

লোকটা তখন বলল, "মহারাজ, আমি একটা মন্ত্র জানি, আমি যুগজন্ম ধরে বসে আছি দ্রিঘাংচুর দেখা পেলে সেই মন্ত্র যদি তাকে বলতে পারতাম তা হলে কি যে আশ্চর্য কান্ড হত তা কেউ জানে না। কারণ, তার কথা কোনো বইয়ে লেখেনি। হায় রে হায়, এমন সুযোগ আর কি পাব?" রাজা বললেন, "মন্ত্রটা আমায় বলত।" লোকটা বলল, "সর্বনাশ! সে মন্ত্র দ্রিঘাংচুর সামনে ছাড়া কারুর কাছে উচ্চারণ করতে নেই। আমি একটা কাগজে লিখে দিচ্ছি—আপনি দু'দিন উপোস ক'রে তিন দিনের দিন সকালে উঠে সেটা পড়ে দেখবেন। আপনার সামনে দাঁড়কাক দেখলে, তাকে আপনি মন্ত্র শোনাতে পারেন, কিন্তু খবরদার, আর কেউ যেন তা না শোনে—কারণ, দাঁড়কাক যদি দ্রিঘাংচু না হয়, আর তাকে মন্ত্র বলতে গিয়ে অন্য লোকে শুনে ফেলে, তা হ'লেই সর্বনাশ!"

সর্বনাশ!"

তখন সভা ভঙ্গ হল। সভার সকলে এতক্ষণ হাঁ ক'রে শুনছিল, তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল; সকলে দ্রিঘাংচুর কথা, মন্ত্রের কথা আর আশ্চর্য ফল পাওয়ার কথা বলাবলি করতে করতে বাড়ি চলে গেল।

তারপর রাজা মশাই দু'দিন উপোস ক'রে তিন দিনের দিন সকালবেলা—সেই লোকটার লেখা কাগজখানা খুলে পড়লেন। তাতে লেখা আছে—

"হল্‌দে সবুজ ওরাং ওটাং
ইঁট পাট্‌কেল চিৎ পটাৎ
মুস্কিল আসান উড়ে মালি
ধর্মতলা কর্মখালি।"

রাজা মশাই গম্ভীরভাবে এটা মুখস্থ ক'রে নিলেন। তারপর থেকে তিনি দাঁড়কাক দেখলেই লোকজন সব তাড়িয়ে তাকে মন্ত্র শোনাতেন, আর চেয়ে দেখতেন কোনো রকম আশ্চর্য কিছু হয় কি না! কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি দ্রিঘাংচুর কোনো সন্ধান পাননি।

# খুকির লড়াই দেখা

একদল ইংরেজ সৈন্য মাঠের পাশ দিয়ে লড়ায়ের জায়গায় যাচ্ছে, এমন সময় তাদের একজন হঠাৎ দেখতে পেল, মাঠের কিনারায় একটা খুকী ঘুমাচ্ছে! আশেপাশে কোথাও লোকজন নাই, ঘর বাড়ি যা কিছু ছিল কোন কালে গোলা লেগে ছাতু হ'য়ে গেছে—এমন জায়গায় খুকী আস্‌ল কোথা থেকে? খুকীর বয়স বছর দুই, টুক্‌টুক্ ক'রে হেঁটে বেড়ায়, অতি মিষ্টি ক'রে দু' চারটি কথা বলে ফরাসী ভাষায়। সে যে কোথা থেকে এল তা সে বুঝিয়ে বলতে পারে না। সৈন্যরা ঠিক করল, তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাওয়া যাক্, পরে খোঁজ ক'রে যা হয় একটা করা যাবে। লড়াইয়ের জায়গায় মাটির মধ্যে খাদ কেটে সৈন্যরা সব সময় হুঁশিয়ার হয়ে বসে থাকে—কখন একদিন, কখন দুদিন, কখন বা সপ্তাহ ধ'রে এক একদলে সেই খাদের মধ্যে থাকতে হয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে তারা খুকীকে নিয়েই আস্তে আস্তে খাদের মধ্যে ঢুকল।

সামনে জার্মানদের খাদ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে এদিক ওদিক গোলা ফাটার শব্দ হচ্ছে, কখন বা দুটো একটা বন্দুকের গুলি সোঁ ক'রে মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু খুকুমনির তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। সৈন্যরা তার জন্য খড় দিয়ে আর বালির বস্তা দিয়ে সুন্দর বিছানা ক'রে দিয়েছে—তার মধ্যে সে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাচ্ছে! সকাল হতেই কামানের লড়াই আরম্ভ হল—প্রথমটা অল্প-সল্প—তারপরে ক্রমেই বেশি। খুকী তখন ঘুম থেকে উঠেছে, সে প্রথম প্রথম দুম্‌দাম্ শব্দে বোধ হয় একটু ভয় পেয়েছিল—কিন্তু খানিকক্ষণ শুনে শুনে আপনা হতেই ভয় ভেঙ্গে গেল। সে তখন খাদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে আলাপ করতে লাগল।

তারপর একদিন যায়, দুদিন যায়, সৈন্যরা তখনও সেখান থেকে বদলি হয় নি। তিন দিনের দিন জার্মানরা খাদের উপর প্রকান্ড এক বোমা ফেলল। বোমা ভয়ানক শব্দে ফাট্‌বামাত্র খাদের খানিকটা ধ'সে গিয়ে কতগুলো লোক চাপা পড়ল। অমনি সকলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "আগে খুকীকে দেখ।" খুকী এক কোণে পুঁটুলি পাকিয়ে দিব্যি ঘুমিয়ে আছে। পরদিন সকালবেলা সকলে খাওয়া-দাওয়া করছে—এমন সময় একজন চেঁচিয়ে উঠল "দেখ, খুকীটা কোথায় গেল"; সকলে চেয়ে দেখে খুকীটা জার্মান খাদের দিকে খুট্‌খুট্ ক'রে হেঁটে যাচ্ছে। জার্মানরা তো ব্যাপার দেখে অবাক্! খানিক বাদে তারা খুকীটাকে ডাকতে লাগল। খুকীও তাদের খাদে গিয়ে অনেক চকলেট লজঞ্চুস্ আদায় ক'রে ভারি খুশী হয়ে ফিরে এল। এম্নি ক'রে তারা এক সপ্তাহ কাটাল।

তারপর দু বছর কেটে গেছে—সেই খুকীর বাবা-মার কোন খবর পাওয়া যায় নি। সেই সৈন্যদলই এখনও তাকে খরচ দিয়ে খাইয়ে পড়িয়ে মানুষ করছে। অবশ্য এখন সে আর লড়াইয়ের জায়গায় থাকে না—সে থাকে লন্ডনে—সকলে তার নাম রেখেছে ফিলিস্।

# কুকুরের মালিক

ভজহরি আর রামচরণের মধ্যে ভারি ভাব। অন্তত, দুই সপ্তাহ আগেও তাহাদের মধ্যে খুবই বন্ধুতা দেখা যাইত।

সেদিন বাঁশপুকুরের মেলায় গিয়া তাহারা দুইজন মিলিয়া একটা কুকুরছানা কিনিয়াছে। চমৎকার বিলাতি কুকুর—তার আড়াই টাকা দাম। ভজুর পাঁচসিকা আর রামার পাঁচসিকা—দুইজনের পয়সা মিলাইয়া কুকুর কেনা হইল। সুতরাং দুইজনেই কুকুরের মালিক।

কুকুরটাকে বাড়িতে আনিয়াই ভজু বলিল, "অর্ধেকটা কুকুর আমার, অর্ধেকটা তোর।" রামা বলিল, "বেশ কথা! মাথার দিকটা আমার, ল্যাজের দিকটা তোর।" ভজু একটু ভাবিয়া দেখিল, মন্দ কি! মাথার দিকটা যার সেই তো কুকুরকে খাওয়াইবে, যত হাঙ্গাম সব তার। তাছাড়া কুকুর যদি কাউকে কামড়ায়, তবে মাথার দিকের মালিকই দায়ী, ল্যাজের মালিকের কোন দোষ দেওয়া চলিবে না। সুতরাং সে বলিল, "আচ্ছা, ল্যাজের দিকটাই নিলাম।"

দুইজনে দুপুর বেলায় বসিয়া কুকুরটার পিঠে হাত বুলাইয়া তোয়াজ করিত। রামা বলিত, "দেখিস, আমার দিকে হাত বোলাসনে।" ভজু বলিত, "খবরদার, এদিকে হাত আনিসনে।" দুইজনে খুব সাবধানে নিজের নিজের ভাগ বাঁচাইয়া চলিত। যখন ভজুর দিকের পা তুলিয়া কুকুরটা রামার দিকে কান চুলকাইত, তখন ভজু খুব উৎসাহ করিয়া বলিত, "খুব দে—আচ্ছা করে খাম্‌চিয়ে দে।" আবার ভজুর দিকে মাছি বসিলে রামার দিকের মুখটা যখন সেখানে কামড়াইতে যাইত, তখন রামা আহাদে আটখানা হইয়া বলিত, "দে কামড়িয়ে! একেবারে দাঁত বসিয়ে দে।"

একদিন একটা মস্ত লাল পিঁপড়ে কুকুরের পিঠে কামড়াইয়া ধরিল। কুকুরটা গা ঝাড়া দিল, পিঠে জিভ লাগাইবার চেষ্টা করিল, নানারকম অঙ্গভঙ্গী করিয়া পিঠটাকে দেখিবার চেষ্টা করিল। তারপর কিছুতেই কৃতকার্য না হইয়া কেঁউ কেঁউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন দুইজনে বিষম তর্ক উঠিল, কার ভাগে কামড় পড়িয়াছে। এ বলে, "তোর দিকে পিঁপড়ে লেগেছে—তুই ফেলবি," ও বলে, "আমার বয়ে গেছে পিঁপড়ে ফেলতে—তোর দিকে কাঁদছে, সে তুই বুঝবি।" সেদিন দুইজনে প্রায় কথা-বার্তা বন্ধ হইবার জোগাড়।

তারপর একদিন কুকুরের কী খেয়াল চাপিল, সে তাহার নিজের ল্যাজটা লইয়া খেলা আরম্ভ করিল। নেহাৎ 'কুকুরে' খেলা—তার না আছে অর্থ, না আছে কিছু। সে ধনুকের মত একপাশে বাঁকা হইয়া ল্যাজটার দিকে তাকাইয়া দেখে আর একটু একটু ল্যাজ নাড়ে। সেটা যে তার নিজের ল্যাজ, সে খেয়াল বোধহয় তার থাকে না—তাই হঠাৎ অতর্কিতে ল্যাজ ধরিবার জন্য সে বোঁ করিয়া ঘুরিয়া যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরটাও নড়িয়া যায়, কাজেই ল্যাজটা আর ধরা হয় না। ভজু আর রামা এই ব্যাপার দেখিয়া উৎসাহে চিৎকার করিতে লাগিল। রামার মহা স্ফূর্তি যে ভজুর ল্যাজকে তাড়া করা হইতেছে, আর ভজুর ভারি উৎসাহ যে তার ল্যাজ রামার মুখকে ফাঁকি দিয়া নাকাল করিতেছে।

দুইজনের চিৎকারের জন্যই হোক কী নিজের ট্যাঁটামির জন্যই হোক কুকুরটার জিদ চড়িয়া গেল। সমস্তদিন সে থাকিয়া থাকিয়া চর্কীবাজির মত নিজের ল্যাজকে তাড়া করিয়া ফিরিতে লাগিল। এইরকমে খামখা পাক দিতে দিতে কুকুরটা যখন হয়রান হইয়া হাঁপাইতে লাগিল, তখন রামা ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ভজু বলিল, "আমার দিকটাই জিতিয়াছে।"

কিন্তু কুকুরটা এমন বেহায়া, পাঁচমিনিট যাইতে ন যাইতেই সে আবার ল্যাজ তাড়ান শুরু করিল। তখন রামা রাগিয়া বলিল, "এইয়ো! তোমার ল্যাজ সামলাও। দেখছ না কুকুরটা হাঁপিয়ে পড়ছে?" ভজু বলিল, "সামলাতে হয় তোমার দিক সামলাও—ল্যাজের দিকে তো আর হাঁপাচ্ছে না!" রামা ততক্ষণে রীতিমত চটিয়াছে। সে কুকুরের পিছন পিছন গিয়া ধাঁই করিয়া এক লাথি লাগাইয়া দিল। ভজু বলিল, "তবে রে! আমার দিকে লাথি মারলি কেন রে?" এই বলিয়াই সে কুকুরের মাথায় ঘাড়ে কানে চটাপট কয়েকটা চাঁটি লাগাইয়া দিল। দুই দিক হইতেই রেষারেষির চোটে কুকুরটা ছুটিয়া পালাইল। তখন দুইজনে বেশ একচোট হাতাহাতি হইয়া গেল।

পরের দিন সকালে উঠিয়াই রামা দেখে, কুকুরটা আবার ল্যাজ তাড়া করিতেছে। তখন সে কোথা হইতে একখানা দা' আনিয়া এক কোপে ক্যাঁচ্ করিয়া ল্যাজের খানিকটা এমন পরিপাটি উড়াইয়া দিল যে কুকুরটার আর্তনাদে ভজু ঘুমের মধ্যে লাফ দিয়া একেবারে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত। সে আসিয়াই দেখিল কুকুরের ল্যাজ কাটা, রামার

হাতে দা'। ব্যাপারটা বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না।

তখন সে রামাকে মারিতে মারিতে মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপর কুকুর লেলাইয়া দিল। কুকুরটা ল্যাজ কাটার দরুণ রামার উপর একটুও খুশী হয় নাই—সে নিমকহারাম হইয়া 'রামার দিক' দিয়াই রামার ঠ্যাঙে কামড়াইয়া দিল।

এখন দুইজনেই চায় থানায় নালিশ করিতে। রামা বলে ল্যাজটা ভারি বেয়াড়া, বারবার মুখের সঙ্গে ঝগড়া লাগাইতে চায়—তাই সে ল্যাজ কাটিয়াছে। ল্যাজ না কাটিলে কুকুর পাগল হইয়া যাইত, না হয় সর্দিগর্মি হইয়া মরিত। মারা গেলে ত' সমস্ত কুকুরই মারা যাইত, সুতরাং ল্যাজ কাটার দরুণ গোটা কুকুরটারই উপকার হইয়াছে। মুখও বাঁচিয়াছে, ল্যাজও বাঁচিয়াছে; তাতে রামারও ভাল, ভজুরও ভাল। কিন্তু ভজুর এতবড় আস্পর্ধা যে সে রামার দিকের কুকুরকে রামার উপরে লেলাইয়া দিল। মুখের দিকে ভজুর কোন দাবিদাওয়া নাই, সে দিকটা সম্পূর্ণভাবেই রামার—সুতরাং রামার অনুমতি ছাড়া ভজু কোন্ সাহসে এবং কোন্ শাস্ত্র বা আইন মতে তাহা লইয়া পরের ধনে পোদ্দারি করিতে যায়: ইহাতে অনধিকারচর্চা চুরি তছরূপ—সব রকম নালিশ চলে।

ভজু কিন্তু বলে অন্যরকম। সে বলে রামার দিকের কুকুর রামাকে কামড়াইয়াছে, তাকে ভজুর কি দোষ? ভজু কেবল 'লে লে লে' বলিয়াছিল; তাহাতে কুকুর যদি রামাকে কামড়ায়, তবে সেটা তার শিক্ষার দোষ—রামা তাহাকে ভাল করিয়া শিক্ষা দেয় নাই কেন? তাছাড়া ভজুর ল্যাজ খেলা করিতে চায়, রামার হিংসুটে মুখটা তাহাতে আপত্তি করে কেন? ভজুর ল্যাজকে কামড়াইতে যাইবার তাহার কি অধিকার আছে? আর, রামা তার কুকুরের চোখ বাঁধিয়া কিংবা মুখোস আঁটিয়া দিলেই পারিত—সে ল্যাজ কাটিতে গেল কাহার হুকুমে? একবার নালিশটি করিলে রামচরণ "বাপ বাপ" বলিয়া ছয়টি মাস জেল খাটিয়া আসিবেন—তা নইলে ভজুর নাম ভজহরিই নয়।

এখন এ তর্কের আর মীমাংসাই হয় না। আমাদের হরিশকুড়ো বলিয়াছিলেন, "এক কাজ কর্, কুকুরটার নাকের ডগা থেকে ল্যাজের আগা পর্যন্ত দাঁড়ি টেনে তার ডান দিকটা তুই নে, বাঁ দিকটা ওকে দে—তা হ'লেই ঠিকমত ভাগ হবে।" কিন্তু তাহারা ওরকম "ছিল্কা কুকুরের" মালিক হইতে রাজী নয়। কেউ কেউ বলিল, "তা কেন? ভাগাভাগির দরকার কি? গোটা কুকুরটাই রামার, আবার গোটা কুকুরটাই ভজুর।" কিন্তু এ কথায়ও তাহাদের খুব আপত্তি। একটা বই কুকুর নাই, তার গোটা কুকুরটাই যদি রামার হয় তবে ভজুর আবার কুকুর আসে কোথা হইতে? আর রামার গোটা কুকুরটাই যদি ভজুর হয়, তবে রামার আর থাকিল কি? কুকুর থেকে কুকুর বাদ, বাকি রইল শূন্যি!

এখন তোমরা যদি ইহার মীমাংসা করিয়া দাও।

# নন্দলালের মন্দ কপাল

নন্দলালের ভারি রাগ, অঙ্কের পরীক্ষায় মাস্টার তাহাকে গোল্লা দিয়াছেন। সে যে খুব ভালো লিখিয়াছিল তাহা নয়, কিন্তু তা বলিয়া একেবারে গোল্লা দেওয়া কি উচিত ছিল ? হাজার হোক সে একখানা পুরা খাতা লিখিয়াছিল তো ! তার পরিশ্রমের কি কোনো মূল্য নাই? ঐ যে ত্রৈরাশিকের অঙ্কটা, সেটা তো তার প্রায় ঠিকই হইয়াছিল, কেবল একটুখানি হিসেবের ভুল হওয়া উত্তরটা ঠিক মেলে নাই। আর ঐ যে একটা ডেসিমাল্ অঙ্ক ছিল, সেটাতে গুণ করিতে গিয়া সে ভাগ করিয়া বসিয়াছিল, তাই বলিয়া কি একটা নম্বরও দিতে নাই? আরও অন্যায় এই যে, এই কথাটা মাস্টার মহাশয় ক্লাশের ছেলেদের কাছে ফাঁস করিয়া ফেলিয়াছেন। কেন? আর একবার হরিদাস যখন গোল্লা পাইয়াছিল, তখন সে তো কথাটা রাষ্ট্র হয় নাই !

সে যে ইতিহাসের একশোর মধ্যে পঁচিশ পাইয়াছে, সেটা বুঝি কিছু নয়? খালি অঙ্ক ভালো পারে নাই বলিয়াই তাহাকে লজ্জিত হইতে হইবে? সব বিষয়ে যে সকলকে ভালো পারিতে হইবে তাহারই বা অর্থ কি? স্বয়ং নেপোলিয়ান যে ছেলেবেলায় ব্যাকরণে একেবারে আনাড়ী ছিলেন, সে বেলা কি? তাহার এই যুক্তিতে ছেলেরা দমিল না, এবং মাস্টারের কাছে এই তর্কটা তোলাতে তাঁহারাও যে যুক্তিটাকে খুব চমৎকার ভাবিলেন, এমন তো বোধ হইল না। তখন নন্দলাল বলিল, তাহার কপালই মন্দ—সে নাকি বরাবর তাহা দেখিয়া আসিতেছে।

সেই তো যেবার ছুটির আগে তাহাদের পাড়ায় হাম দেখা দিয়াছিল, তখন বাড়িসুদ্ধ সকলেই হামে ভুগিয়া দিব্যি মজা করিয়া স্কুল কামাই করিল, কেবল বেচারা নন্দলালকেই নিয়মমতো প্রতিদিন স্কুলে হাজিরা দিতে হইয়াছিল। তারপর যেমন ছুটি আরম্ভ হইল, অমনি তাহাকে জ্বরে আর হামে ধরিল—ছুটির অর্ধেকটাই মাটি ! সেই যেবার সে মামার বাড়ি গিয়াছিল, সেবার তাহার মামাতো ভাইয়েরা কেহ বাড়ি ছিল না—ছিলেন কোথাকার এক বদমেজাজি মেশো, তিনি উঠিতে বসিতে কেবল ধমক আর শাসন ছাড়া আর কিছু জানিতেন না। তাহার উপর সেবার এমন বৃষ্টি হইয়াছিল, একদিনও ভালো করিয়া খেলা জমিল না, কোথাও বেড়ানো গেল না। সেই জন্য পরের বছর যখন আর সকলে মামার বাড়ি গেল তখন সে কিছুতেই যাইতে চাহিল না। পরে শুনিল সেবার নাকি সেখানে চমৎকার মেলা বসিয়াছিল, কোন রাজার দলের সঙ্গে পঁচিশটি হাতি আসিয়াছিল, আর বাজি যা পোড়ানো হইয়াছিল সে একেবারে আশ্চর্য রকম ! নন্দলালের ছোট ভাই যখন বার বার উৎসাহ করিয়া তাহার কাছে এই সকলের বর্ণনা করিতে লাগিল, তখন নন্দ তাহাকে এক চড় মারিয়া বলিল, "যা যা ! মেলা বক্‌বক্ করিসনে !" তাহার কেবল মনে হইতে লাগিল সেবার সে মামার বাড়ি গিয়াও ঠকিল, এবার না গিয়াও ঠকিল ! তাহার মতো কপাল-মন্দ আর কেহ নাই।

স্কুলেও ঠিক তাই। সে অঙ্ক পারে না—অথচ অঙ্কের জন্য দুই-একটা প্রাইজ আছে—এদিকে ভূগোল ইতিহাস তাহার কণ্ঠস্থ কিন্তু ঐ দুইটার একটাতেও প্রাইজ নাই। অবশ্য সংস্কৃতেও সে নেহাত কাঁচা নয়, ধাতু প্রত্যয় বিভক্তি সব চট্‌পট্ মুখস্থ করিয়া ফেলে—চেষ্টা করিলে কি পড়ার বই আর অর্থ-পুস্তকটাকেও সড়গড় করিতে পারে না? ক্লাশের মধ্যে খুদিরাম একটু-আধটু সংস্কৃত জানে—কিন্তু তাহা তো বেশি নয় । নন্দলাল ইচ্ছা করিলে কি তাহাকে হারাইতে পারে না? নন্দ জেদ করিয়া স্থির করিল, 'একবার খুদিরামকে দেখে নেব। ছোকরা এ বছর সংস্কৃতের প্রাইজ পেয়ে ভারি দেমাক করছে—আবার অঙ্কের গোল্লার জন্য আমাকে খোঁটা দিতে এসেছিল। আচ্ছা, এবার দেখা যাবে।'

নন্দলাল কাহাকেও না জানাইয়া সেইদিন হইতেই বাড়িতে ভয়ানক ভাবে পড়িতে শুরু করিল। ভোরে উঠিয়াই সে 'হসতি হসত হসন্তি' শুরু করে, রাত্রেও 'অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলীতরু' বলিয়া ঢুলিতে থাকে। কিন্তু ক্লাশের ছেলেরা এ কথার বিন্দুবিসর্গও জানে না। পন্ডিত মহাশয় যখন ক্লাশে প্রশ্ন করেন, তখন মাঝে মাঝে উত্তর জানিয়াও সে চুপ করিয়া মাথা চুলকাইতে থাকে, এমন কি কখনো ইচ্ছা করিয়া দু-একটা ভুল বলে, পাছে খুদিরাম তার পড়ার খবর টের পাইয়া আরও বেশি করিয়া পড়ায় মন দিতে থাকে ! তাহার ভুল উত্তর শুনিয়া খুদিরাম মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে, নন্দলাল তাহার কোনো জবাব দেয় না; কেবল খুদিরাম নিজে যখন এক-একটা ভুল করে, তখন সে মুচকি মুচকি হাসে, আর ভাবে, 'পরীক্ষার সময় অম্নি ভুল করলেই এবার ওঁকে সংস্কৃতের প্রাইজ পেতে হবে না।'

ওদিকে ইতিহাসের ক্লাশে নন্দলালের প্রতিপত্তি কমিতে লাগিল। কারণ, ইতিহাস আর ভূগোল নাকি এক রকম শিখিলেই পাশ করা যায়—তাহার জন্য নন্দর কোনো ভাবনা নাই। তাহার সমস্ত মনটা রহিয়াছে ঐ সংস্কৃত পড়ার উপরে—অর্থাৎ সংস্কৃত প্রাইজটার উপরে ! একদিন মাস্টার মহাশয় বলিলেন, "কি হে নন্দলাল, আজকাল বুঝি বাড়িতে কিছু পড়াশুনা কর না? সব বিষয়েই যে তোমার এমন দুর্দশা হচ্ছে তার অর্থ কি?" নন্দ আর একটু হইলেই বলিয়া ফেলিত' "আজ্ঞে সংস্কৃত পড়ি', কিন্তু কথাটাকে হঠাৎ সামলায়া "আজ্ঞে সংস্কৃত—না সংস্কৃত নয়" বলিয়াই সে থতমত খাইয়া গেল। খুদিরাম তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিয়, "কৈ" সংস্কৃতও তো কিছু পারে না।" শুনিয়া ক্লাশসুদ্ধ ছেলে হাসিতে লাগিল। নন্দ একটু অপ্রস্তুত হইল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল—ভাগ্যিস্ তাহার সংস্কৃত পড়ার কথাটা ফাঁস হইয়া যায় নাই।

দেখিতে দেখিতে বছর কাটিয়া আসিলে, পরীক্ষার সময় প্রায় উপস্থিত। সকলে পড়ার কথা, পরীক্ষার কথা আর প্রাইজের কথা বলাবলি করিতেছে, এমন সময় একজন জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে! নন্দ এবার কোন প্রাইজটা নিচ্ছ?" খুদিরাম নন্দর মতো গলা করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে সংস্কৃত, না সংস্কৃত নয়।" সকলে হাসিল, নন্দও খুব উৎসাহ করিয়া সেই হাসিতে যোগ দিল। মনে ভাবিল, 'বাছাধন, এ হাসি আর তোমার মুখে বেশিদিন থাকছে না।'

যথাসময়ে পরীক্ষা আরম্ভ হইল এবং যথাসময়ে শেষ হইল। পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য সকলে আগ্রহ করিয়া আছে, নন্দও রোজ নোটিশবোর্ডে গিয়া দেখে, তাহার নামে সংস্কৃত প্রাইজ পাওয়ার কোনো বিজ্ঞাপন আছে কিনা। তারপর একদিন হেডমাস্টার মহাশয় এক তাড়া কাগজ লইয়া ক্লাশে আসিলেন, আসিয়াই গম্ভীর ভাবে বলিলেন, 'এবার দু-একটা নতুন প্রাইজ হয়েছে আর অন্য বিষয়েও কোনো কোনো পরিবর্তন হয়েছে।" এই বলিয়া তিনি পরীক্ষার ফলাফল পড়িতে লাগিলেন। তাহাতে দেখা গেল, ইতিহাসের জন্য কে যেন একটা রূপার মেডেল দিয়াছেন। খুদিরাম ইতিহাসে প্রথম হইয়াছে, সে-ই ঐ মেডেলটা লইবে। সংস্কৃতে নন্দ প্রথম, খুদিরাম দ্বিতীয়—কিন্তু এবার সংস্কৃতে কোনো প্রাইজ নাই।

হায় হায় ! নন্দর অবস্থা তখন শোচনীয় ! তাহার ইচ্ছা হইতেছিল সে ছুটিয়া গিয়া খুদিরামকে কয়েকটা ঘুঁষি লাগাইয়া দেয়। কে জানিত এবার ইতিহাসের জন্য প্রাইজ থাকিবে, আর সংস্কৃতের জন্য থাকিবে না। ইতিহাসের মেডেলটা তো সে অনায়াসেই পাইতে পারিত। কিন্তু তাহার মনের কষ্ট কেহ বুঝিল না—সবাই বলিল, "বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে—কেমন করে ফাঁকি দিয়ে নম্বর পেয়েছে।" দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া নন্দ বলিল, "কপাল মন্দ!"

# নতুন পন্ডিত

আগে যিনি আমাদের পন্ডিত ছিলেন, তিনি লোক বড় ভালো। মাঝে মাঝে আমাদের যে ধমক-ধামক না করিতেন, তাহা নয়, কিন্তু কখনও কাহাকেও অন্যায় শাস্তি দেন নাই। এমন কি ক্লাশে আমরা কত সময় গোল করিতাম, তিনি মাঝে মাঝে 'আঃ' বলিয়া ধমক দিতেন। তাঁর হাতে একটা ছড়ি থাকিত, খুব বেশি রাগ করিলেই সেই ছড়িটাকে টেবিলের উপর আছড়াইতেন—সেটাকে কোনো দিন কাহারও পিঠে পড়িতে দেখি নাই। তাই আমরা কেউ তাঁহাকে মানিতাম না।

আমাদের হেডমাস্টার মশাইটি দেখিতে তাঁর চাইতেও নিরীহ ভালোমানুষ। ছোট্ট বেঁটে মানুষটি, গোঁফ দাঁড়ি কামানো, গোলগাল মুখ, তাহাতে সর্বদাই যেন হাসি লাগিয়াই আছে। কিন্তু চেহারায় কি হয়? তিনি যদি 'শ্যামাচরণ কার নাম?" বলিয়া ক্লাসে আসিয়াই আমায় ডাক দিতেন, তবে তাঁর গলার আওয়াজেই আমার হাত পা যেন পেটের মধ্যে ঢুকিয়া যাইত। তাঁর হাতে কোনো দিন বেত দেখি নাই, কারণ বেতের কোনো দরকার হইত না—তাঁর হুঙ্কারটি যার উপর পড়িত সেই চক্ষে অন্ধকার দেখিত।

একদিন পন্ডিতমহাশয় বলিলেন, "সোমবার থেকে আমি আর পড়াতে আসব না—কিছু দিনের ছুটি নিয়েছি। আমার জায়গায় আর একজন আসবেন। দেখিস তাঁর ক্লাশে তোরা যেন গোল করিস্‌নে।" শুনিয়া আমাদের ভারি উৎসাহ লাগিল; তারপর যে কয়দিন পন্ডিতমহাশয় স্কুলে ছিলেন, আমরা ক্লাশে এক মিনিটও পড়ি নাই। একদিন বেহারীলাল পড়ার সময় পড়িয়াছিল, সেজন্য আমরা পরে চাঁদা করিয়া তাহার কান মলিয়া দিয়াছিলাম। যাহা হউক, পন্ডিতমহাশয় সোমবার আর আসিলেন ন—তাঁর বদলে যিনি আসিলেন তাঁর গোল কালো চশমা, মুখভরা গোঁফের জঙ্গল আর বাঘের মতো আওয়াজ শুনিয়া আমাদের উৎসাহ দমিয়া গেল। তিনি ক্লাশে আসিয়াই বলিলেন, "পড়ার সময় কথা বলবে না, হাসবে না, যা বলব তাই করবে। রোজকার পড়া রোজ করবে। আর যদি তা না কর, তা হলে তুলে আছাড় দেব।" শুনিয়া আমাদের তো চক্ষু স্থির !

ফকির চাঁদের তখন অসুখ ছিল, সে বেচারা কদিন পরে ক্লাশে আসিতেই নূতন পন্ডিতমহাশয় তাহাকে পড়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন। ফকির থতমত খাইয়া ভয়ে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল—"আজ্ঞে—আমি ইস্কুলে আসিনি—" পন্ডিতমহাশয় রাগিয়া বলিলেন, "ইস্কুলে আসনি তো কোথায় এসেছ? তোমার মামার বাড়ি?" বেচারা কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, "সাতদিন ইস্কুলে আসিনি, কি করে পড়া বলব?" পন্ডিতমহাশয়, "চোপরাও বেয়াদব—মুখের উপর মুখ" বলিয়া এমন ভয়ানক গর্জন করিয়া উঠিলেন যে ভয়ে ক্লাশ সুদ্ধ ছেলের মুখের তালু শুকাইয়া গেল।

আমাদের হরিপ্রসন্ন অতি ভালো ছেলে। সে একদিন ইস্কুলের অফিসে গিয়া খবর পাইল—সে নাকি এবার কি একটা প্রাইজ পাইবে। খবরটা শুনিয়া বেচারা ভারি খুশি হইয়া ক্লাশে আসিতেছিল, এমন সময় নূতন পন্ডিতমহাশয় "হাসছ কেন" বলিয়া হঠাৎ এমন ধমক দিয়া উঠিলেন যে মুখের হাসি এক মুহূর্তে আকাশে উড়িয়া গেল। তাহার পরদিন আমাদের ক্লাশের বাহিরে রাস্তার ধারে কে যেন হো হো করিয়া হাসিতেছিল, শুনিয়া পন্ডিতমহাশয় পাশের ঘর হইতে হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়া আর কথাবার্তা নাই—"কেবল হাসি?" বলিয়া হরিপ্রসন্নর গালে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া কয়েক চড় লাগাইয়া, আবার হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই অবধি হরিপ্রসন্নর উপর তিনি বিনা কারণে যখন তখন খাপ্পা হইয়া উঠিতেন। দেখিতে দেখিতে ইস্কুল সুদ্ধ ছেলে নূতন পন্ডিতের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল।

একদিন আমাদের অঙ্কের মাস্টার আসেন নাই, হেডমাস্টার রামবাবু বলিয়া গেলেন—তোমরা ক্লাশে বসিয়া পুরাতন পড়া পড়িতে থাক। আমরা পড়িতে লাগিলাম, কিন্তু খানিক বাদেই পন্ডিতমহাশয় পাশের ঘর হইতে "পড়ছ না কেন?" বলিয়া টেবিলে প্রকান্ড এক ঘুঁষি মারিলেন। আমরা বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, পড়ছি তো।" তিনি আবার বলিলেন, "তবে শুনতে পাচ্ছি না কেন, চেঁচিয়ে পড়।" যেই বলা অমনি বোকা ফকিরচাঁদ

'অন্ধকারে চৌরাশিটা নরকের কুন্ড
তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুন্ড—'

বলিয়া এমন চেঁচাইয়া উঠিল যে, পন্ডিতমহাশয়ের চোখ হইতে চশমাটা পড়িয়া গেল। মাস্টার মহাশয় গম্ভীরভাবে ঘরের মধ্যে ঢুকিলেন, তারপর কেন জানি না হরিপ্রসন্নর কানে ধরিয়া তাহাকে সমস্ত স্কুল ঘুরাইয়া আনিলেন, তাহাকে তিনদিন ক্লাশে দাঁড়াইয়া থাকিতে হুকুম দিলেন, একটানা জরিমানা করিলেন, তাহার কালো কোটের পিঠে খড়ি দিয়া 'বাঁদর' লিখিয়া দিলেন, আর ইস্কুল হইতে তাড়াইয়া দিবেন বলিয়া শাসাইয়া রাখিলেন।

পরদিন রামবাবু হরিপ্রসন্নকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং তার কাছে সমস্ত কথা শুনিয়া আমাদের ক্লাশে খোজ করিতে আসিলেন। তখন ফকিরচাঁদ বলিল, 'আজ্ঞে হরে চেঁচায়নি, আমি চেঁচিয়েছি।" রামবাবু বলিলেন, 'পন্ডিতমশাইকে পাতকী বলিয়া কি গালাগালি করিয়াছিলে?" ফকির বলিল, 'পন্ডিতমশাইকে কিছুই বলিনি, আমি পড়ছিলাম—

'অন্ধকারে চৌরাশিটা নরকের কুন্ড
তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুন্ড—'

এই সময় নূতন পন্ডিতমহাশয় ক্লাশের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বোধ হয় শেষ কথাটুকু শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন তাঁহাকে লইয়া কিছু একটা ঠাট্টা করা হইয়াছে। তিনি রাগে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া হাঁ হাঁ করিয়া ক্লাশের মধ্যে আসিয়া রামবাবুর কালো কোট দেখিয়াই "তবে রে হরিপ্রসন্ন" বলিয়া হেডমাস্টার মহাশয়কে পিটাইতে লাগিলেন। আমরা ভয়ে কাঠ হইয়া রহিলাম। হেডমাস্টার মহাশয় অনেক কষ্টে পন্ডিতের হাত ছাড়াইয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন যদি পন্ডিতের মুখ দেখিতে! বেচারা ভয়ে একেবারে জুজু! তিন-চারবার হাঁ করিয়া আবার মুখ বুজিলেন, তারপর এদিক ওদিক চাহিয়া এক দৌড়ে সেই যে ইস্কুল হইতে পালাইয়া গেলেন, আর কোনো দিন তাঁকে ইস্কুলে আসিতে দেখি নাই।

দুইদিন পরে পুরাতন পন্ডিতমহাশয় আবার ফিরিয়া আসিলেন। তাঁর মুখ দেখিয়া আমদের যেন ধড়ে প্রাণ আসিল, আমরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সকলে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর তাঁর ক্লাশে গোলমাল করিব না, যতই পড়া দিন না কেন, খুব ভালো করিয়া পড়িব।

# সত্যি

ইনি কে জানো না বুঝি? ইনি নিধিরাম পাটকেল!

কোন্ নিধিরাম? যার মিঠায়ের দোকান আছে?

আরে দুৎ! তা কেন? নিধিরাম ময়রা নয়—প্রফেসার্ নিধিরাম!

ইনি কি করেন?

কি করেন আবার কি? আবিষ্কার করেন!

ও বুঝেছি! ঐ যে উত্তর মেরুতে যায়, যেখানে ভয়ানক ঠান্ডা—মানুষজন সব মরে যায়—

দূর মুখ্যু! আবিষ্কার বললেই বুঝি উত্তর মেরু বুঝতে হবে, বা দেশ বিদেশে ঘুরতে হবে? তাছাড়া বুঝি আবিষ্কার হয় না?

ও! তাহলে?

মানে বিজ্ঞান শিখে নানা রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়া করে নতুন নতুন কথা শিখছেন, নতুন নতুন জিনিস বানাচ্ছেন। ইনি আজ পর্যন্ত কত কী আবিষ্কার করেছেন তোমরা তার খবর রাখ কি? ওঁর তৈরি সেই গন্ধবিকট তেলের কথা শোননি? সেই তেলের আশ্চর্য গুণ! আমি নিজে মাখিনি বা খাইনি কিন্তু আমাদের বাড়িওয়ালার কে যেন বলেছেন যে সে ভয়ঙ্কর তেল। সে তেল খেলে পরে পিলের ওষুধ, মাখলে পরে ঘায়ের মলম, আর গোঁফে লাগালে দেড় দিনে আধহাত লম্বা গোঁফ বেরোয়।

সে কী মশাই! তাও কি হয়?

আলবাৎ হয়! বললে বিশ্বাস করবে না, কিন্তু নন্দলাল ডাক্তার বলেছে ভুলু মিত্তিরের খোকাকে ওই তেল মাখিয়ে তার এয়া মোটা গোঁফ হয়ে গেছিল।

কি আবোল তাবোল বকছেন মশাই!

বিশ্বেস করতে না চাও তা বিশ্বেস করো না, কিন্তু চোখে যা দেখছ তা বিশ্বেস করবে ত? কী কান্ড হচ্ছে দেখছ তো? ঐ দেখ নিধিরাম পাটকেলের নতুন কামান তৈরি হচ্ছে। নতুন কামান, নতুন গোলা, নতুন সব। একি সহজ কথা ভেবেছ? ওই রকম আর গোটা পঞ্চাশ কামান আর হাজার দশেক গোলা তৈরি হলেই উনি লড়াই করতে বেরুবেন।

সব নতুন রকম হচ্ছে বুঝি?

নতুন ন তো কি? নতুন, অথচ সস্তা! ওই দেখ কামান আর ওই দেখ গোলা, কামানে কি আছে? নল আছে আর বাতাস ভরা হাপর আছে। নলের মধ্যে গোলা ভরে খুব খানিক দম নিয়ে ভ—শ্ করে যেমনি হাপর চেপে ধরবে অমনি হশ্ করে গোলা গিয়ে ছিট্‌কে পড়বে আর ফট্ করে ফেটে যাবে।

তারপরে?

তার পরেই তো হচ্ছে আসল মজা। গোলার মধ্যে কি আছে জান? বিচুটির আরক আছে, লঙ্কার ধোঁয়া আছে, ছারপোকার আতর আছে, গাঁদালের রস আছে, পচা মুলোর একস্ট্রাকট আছে, আরও যে কত কি আছে, তার নামও আমি জানি না। যত রকম উৎকট বিশ্রী গন্ধ আছে, যত রকম ঝাঁঝালো তেজাল বিটকেল জিনিস আছে, আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক কৌশলে সব তিনি মিশিয়েছেন ঐ গোলার মধ্যে। সেদিন ছোট একটা গোলা ওঁর হাত থেকে প'ড়ে ফেটে গিয়েছিল শুনেছ তো?

তাই নাকি? তারপর হল কি?

যেমনি গোলা ফাটল অমনি তিনি চট্ করে একটা ধামা চাপা দিয়েছিলেন, নইলে কি হত কে জানে। তবু দেখছ ওষুদের গন্ধে আর ঝাঁঝে প্রফেসারের চেহারা কেমন হয়ে গেছে। তার আগে ওঁর চেহারা ছিল ঠিক কার্তিকের মত; মাথাভরা কোঁকড়া চুল আর এক হাত লম্বা দাড়ি! সত্যি!

সত্যি নাকি?

সত্যি না তো কি?

# সবজান্তা

আমাদের 'সবজান্তা' দুলিরামের বাবা কোন একটা খবরের কাগজের সম্পাদক। সেই জন্য আমাদের মধ্যে অনেকেরই মনে তাহার সমস্ত কথার উপরে অগাধ বিশ্বাস দেখা যাইত। যে কোনো বিষয়েই হোক, জার্মানির লড়াইয়ের কথাই হোক আর মোহনবাগানের ফুটবলের ব্যাখ্যাই হোক, দেশের বড় লোকেদের ঘরোয়া গল্পই হোক, আর নানারকম উৎকট রোগের বর্ণনাই হোক, যে কোনো বিষয়ে সে মতামত প্রকাশ করিত। একদল ছাত্র অসাধারণ শ্রদ্ধার সঙ্গে সে সকল কথা শুনিত। মাস্টার মহাশয়-দের মধ্যেও কেহ কেহ এ বিষয়ে তাহার ভারি পক্ষপাতী ছিলেন। দুনিয়ার সকল খবর লইয়া সে কারবার করে, সেইজন্য পন্ডিত মহাশয় তাহার নাম দিয়াছিলেন 'সর্বজান্তা'। আমার কিন্তু বরাবরই বিশ্বাস ছিল যে, সবজান্তা যতখানি পান্ডিত্য দেখায় আসলে তাহার অনেকখানি উপরচালাকি। দু-চারিটি বড় বড় শোনা কথা আর খবরের কাগজ পড়িয়া দু-দশটা খবর এইমাত্র তাহার পুঁজি, তারই উপর রঙচঙ দিয়া নানারকম বাজে গল্প জুড়িয়া সে তাহার বিদ্যা জাহির করিত।

একদিন আমাদের ক্লাশে পন্ডিতমহাশয়ের কাছে সে নায়েগ্রা জলপ্রপাতের গল্প করিয়াছিল। তাহাতে সে বলে যে, দশ মাইল উঁচু ও একশত মাইল চওড়া ! একজন ছাত্র বলিল, "সে কি করে হবে? এভারেস্ট সবচেয়ে উঁচু পাহাড়, সে-ই মোটে পাঁচ মাইল।" সবজান্তা তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "তোমরা তো আজকাল খবর রাখ না !" যখনই তাহার কোনো কথায় আমরা সন্দেহ বা আপত্তি করিতাম, সে একটা যা তা নাম করিয়া আমাদের ধমক দিয়া বলিত, "তোমরা কি অমুকের চাইতে বেশি জানো?" আমরা বাহিরে সব সহ্য করিয়া থাকিতাম, কিন্তু এক এক সময় রাগে গা জ্বলিয়া যাইত। সবজান্তা যে আমাদের মনের ভাবটা বুঝিত না, তাহা নয়। সে তাহা বিলক্ষণ বুঝিত এবং সর্বদাই এমন ভাব প্রকাশ করিত যে, আমরা তাহার কথাগুলি মানি বা না মানি, তাহাতে কিছুমাত্র আসে যায় না। নানারকম খবর ও গল্প জাহির করিবার সময় মাঝে মাঝে আমাদের শুনাইয়া বলিত, "অবিশ্যি কেউ কেউ আছেন, যাঁরা এসব কথা মানবেন না।" অথবা "যাঁরা না পড়েই খুব বুদ্ধিমান তাঁরা নিশ্চয়ই এ-সব উড়িয়ে দিতে চাইবেন"—ইত্যাদি। ছোকরা বাস্তবিক অনেক রকম খবর রাখিত, তার উপর তার বোলচালগুলিও ছিল বেশ ঝাঁঝালো রকমের; কাজেই আমরা বেশি তর্ক করিতে সাহস পাইতাম না।

তাহার পরে একদিন, কি কুক্ষণে, তাহার এক মামা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া, আমাদেরই স্কুলের কাছে বাসা লইয়া বসিলেন। তখন আর সবজান্তাকে পায় কে ! তাহাতে কথাবার্তার দৌড় এমন আশ্চর্য রকম বাড়িয়া চলিল যে, মনে হইত বুঝি বা তাহার পরামর্শ ছাড়া ম্যাজিস্ট্রেট হইতে পুলিসের পেয়াদা পর্যন্ত কাহারও কাজ চলিতে পারে না। স্কুলের ছাত্র মহলে তাহার খাতির ও প্রতিপত্তি এমন আশ্চর্য রকম জমিয়া গেল যে, আমরা কয়েক বেচারা, যাহারা বরাবর তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া আসিয়াছি—একেবারে কোণঠাসা হইয়া রহিলাম। এমন কি আমাদের মধ্য হইতে দু-একজন তাহার দলে যোগ দিতেও আরম্ভ করিল।

অবস্থাটা শেষটায় এমন দাঁড়াইল যে, ইস্কুলে আমাদের টেকা দায় ! দশটার সময় মুখ কাঁচামাচু করিয়া ক্লাশে ঢুকিতাম আর ছুটি হইলেই, সকলের ঠাট্টা-বিদ্রূপ হাসি-তামাশার হাত এড়াইবার জন্য দৌড়িয়া বাড়ি আসিতাম। টিফিনের সময়টুকু হেডমাস্টার মহাশয়ের ঘরের সামনে একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া অত্যন্ত ভালো-মানুষের মতো পড়াশুনা করিতাম।

এইরকম ভাবে কতদিন চলিত জানি না, কিন্তু একদিনের একটি ঘটনায় হঠাৎ সবজান্তা মহাশয়ের জারিজুরি সব এমনই ফাঁস হইয়া গেল যে, তাহার অনেকদিনকার খ্যাতি ঐ একদিনেই লোপ পাইল—আর আমরাও সেইদিন হইতে একটু মাথা তুলিতে পারিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সেই ঘটনারই গল্প বলিতেছি।

একদিন শোনা গেল, লোহারপুরের জমিদার রামলালবাবু আমাদের স্কুলে তিন হাজার টাকা দিয়াছেন—একটি ফুটবল গ্রাউন্ড ও খেলার সরঞ্জামের জন্য। আরও শুনিলাম রামলালবাবুর ইচ্ছা সেই উপলক্ষে আমাদের একদিন ছুটি ও একদিন রীতিমতো ভোজের আয়োজন হয় ! কয়দিন ধরিয়া এই খবরটাই আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। কবে ছুটি পাওয়া যাইবে, কবে খাওয়া এবং কি খাওয়া হইবে, এই সকল বিষয়ে জল্পনা চলিতে লাগিল। সবজান্তা দুলিরাম বলিল, যেবার সে দার্জিলিং গিয়াছিল, সেবার নাকি রামলালবাবুর সঙ্গে তাহার দেখা সাক্ষাৎ এমন কি আলাপ-পরিচয় পর্যন্ত হইয়াছিল। রামলালবাবু তাহাকে কেমন খাতির করিতেন, তাহার কবিতা আবৃত্তি শুনিয়া কি কি প্রশংসা করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সে স্কুলের আগে এবং পরে, সারাটি টিফিনের সময় এবং সুযোগ পাইলে ক্লাশের পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকেও নানা অসম্ভব রকম গল্প বলিত। 'অসম্ভব' বলিলাম বটে, কিন্তু তাহার চেলার দল সেসকল কথা নির্বিচারে বিশ্বাস করিতে একটুও বাধা বোধ করিত না।

একদিন টিফিনের সময় উঠানের বড় সিঁড়িটার উপর একদল ছেলের সঙ্গে বসিয়া সবজান্তা গল্প আরম্ভ করিল; একদিন আমি দার্জিলিঙে লাটসাহেবের বাড়ির কাছেই ঐ রাস্তাটায় বেড়াচ্ছি, এমন সময় দেখি রামলালবাবু হাসতে হাসতে আমার দিকে আসছে, তাঁর সঙ্গে আবার এক সাহেব। রামলালবাবু বললেন, "দুলিরাম! তোমার

সেই ইংরাজি কবিতাটা একবার এঁকে শোনাতে হচ্ছে। আমি এঁর কাছে তোমার সুখ্যাতি করছিলাম, তাই ইনি সেটা শুনবার জন্য ভারি ব্যস্ত হয়েছেন !" উনি নিজে থেকে বলছেন, তখন আমি আর কি করি ? আমি সেই 'ক্যাসবিয়াংকা' থেকে আবৃত্তি করলুম। তারপর দেখতে দেখতে যা ভিড় জমে গেল! সবাই শুনতে চায়, সবাই বলে, 'আবার কর।' মহা মুশকিলে পড়ে গেলাম, নেহাত রামলালবাবু বললেন তাই আবার করতে হল। এমন সময় কে যেন পিছন হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "রামলালবাবু কে?" সকলে ফিরিয়া দেখি, একটি রোগা নিরীহগোছের পাড়াগেঁয়ে ভদ্রলোক সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া আছেন। সবজান্তা বলিল, "রামলালবাবু কে, তাও জানেন না? লোহার-পুরের জমিদার রামলাল রায়।" ভদ্রলোকটি অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, তার নাম শুনেছি, সে তোমার কেউ হয় নাকি?" "না, কেউ হয় না, এমনি খুব ভাব আছে আমার সঙ্গে। প্রায়ই চিঠিপত্র চলে।" ভদ্রলোকটি আবার বলিলেন, "রামলালবাবু লোকটি কেমন?" সবজান্তা উৎসাহের সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "চমৎকার লোক। যেমন চেহারা তেমনি কথাবার্তা, তেমনি কায়দা-দুরস্ত। এই আপনার চেয়ে প্রায় আধ হাত খানেক লম্বা হবেন, আর সেইরকম তাঁর তেজ ! আমাকে তিনি কুস্তি শেখাবেন বলেছিলেন, আর কিছুদিন থাকলেই ওটা বেশ রীতিমতো শিখে আসতাম।" ভদ্র-লোকটি বলিলেন, "বল কি হে ? তোমার বয়স কত?" "আজ্ঞে, এইবার তেরো পূর্ণ হবে।" "বটে! বয়সের পক্ষে খুব চালাক তো ! বেশ তো কথাবার্তা বলতে পার! কি নাম হে তোমার ?" সবজান্তা বলিল, "দুলিরাম ঘোষ। রণদাবাবু ডেপুটি আমার মামা হন।" শুনিয়া ভদ্রলোকটি ভারি খুশি হইয়া হেডমাস্টার মহাশয়ের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

ছুটির পর আমরা সকলেই বাহির হইলাম। ইস্কুলের সম্মুখেই ডেপুটিবাবুর বাড়ি তার বাহিরের বারান্দায় দেখি, সেই ভদ্রলোকটি বসিয়া দুলিরামের ডেপুটি-মামার সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন। দুলিরামকে দেখিয়াই মামা ডাক দিয়া বলিলেন—"দুলি, এদিকে আয়, এঁকে প্রণাম কর্—এটি আমার ভাগনে দুলিরাম।" ভদ্রলোকটি হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, এর পরিচয় আমি আগেই পেয়েছি।" দুলিরাম আমাদের দেখাইয়া খুব আড়ম্বর করিয়া ভদ্রলোকটিকে প্রণাম করিল। ভদ্রলোকটি আবার বলিলেন, "আমার পরিচয় জানো না বুঝি?" সবজান্তা এবার আর 'জানি' বলিতে পারিল না, আম্‌তা আম্‌তা করিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। ভদ্রলোকটি তখন বেশ একটু মুচকি মুচকি হাসিয়া আমাদের শুনাইয়া বলিলেন, "আমার নাম রামলাল রায়, লোহারপুরের রামলাল রায়।"

দুলিরাম খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর মুখখানা লাল করিয়া হঠাৎ এক দৌড়ে বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া গেল। ব্যাপার দেখিয়া ছেলেরা রাস্তার উপর হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। তার পরের দিন আমরা স্কুলে আসিয়া দেখিলাম— সবজান্তা আসে নাই, তাহার নাকি মাথা ধরিয়াছে। নানা অজুহাতে সে দু-তিনদিন কামাই করিল, তারপর যেদিন স্কুলে আসিল, তখন তাহাকে দেখিবামাত্র তাহারই কয়েকজন চেলা "কিহে, রামলালবাবুর চিঠিপত্র পেলে?" বলিয়া তাহাকে একেবারে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তারপর যতদিন সে স্কুলে ছিল, ততদিন তাহাকে খেপাইতে হইলে বেশি কিছু করা দরকার হইত না, একটিবার রামলালবাবুর খবর জিজ্ঞাসা করিলেই বেশ তামাশা দেখা যাইত।

# Ek Dojon Sukumar

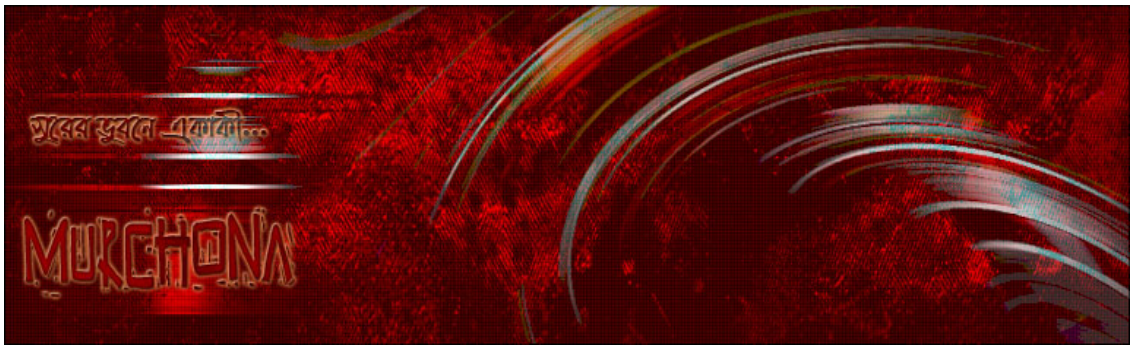


For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com